জ্ঞান-
বিজ্ঞানের
নানা খবর
গোপালচন্দ্র
ভট্টাচার্য

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গোপালচন্দ্র

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা খবর

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ

আগস্ট ১৯৯০

ভাদ্র ১৩৯৭

প্রকাশক

সুভাষচন্দ্র দে

দে'জ পাবলিশিং

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : ধীরেন শাসমল

ছবি : তরুণ চক্রবর্তী

মুদ্রাকর

বি. এন. শীল

ইম্প্রেশন কনসালট্যান্ট

৩২/ই, জয়মিত্র স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০৫

দাম : ১৫ টাকা

Rupees Fifteen Only

সংকলকের উৎসর্গ

গোপালচন্দ্রের চার পুত্র ও এক কন্যা

সুধীরচন্দ্র, বিনয়ভূষণ, নীহাররঞ্জন, মিহিরকুমার

এবং

রানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

এই লেখকের অন্যান্য বই

বাংলার কীটপতঙ্গ

বিজ্ঞান অমনিবাস

করে দেখ ১/২/৩

এবং

অখণ্ড সংস্করণ

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংবাদ

মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি

বাংলার মাকড়সা

ভূমিকা

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস আজকের কথা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তার সূচনা, দীর্ঘ প্রায় দুশো বছর তা একটা সুস্পষ্ট অবয়ব পেয়েছে বলা চলে। এই অবয়বের মধ্যে বিজ্ঞান-সংবাদ পরিবেশনা এবং বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার একটা ভূমিকা আছে।

বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানমনস্কতা গঠন এবং যোগাযোগ অর্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়টির সঙ্গে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার পরিচয় স্থাপন। এ ক্ষেত্রে গোপাল-চন্দ্র ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। গোপালচন্দ্র বাংলায় বহু চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধের লেখক—এর অনেকগুলিই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বিজ্ঞান-সাংবাদিক হিসেবেও তিনি কম শক্তিমান ছিলেন না।

বিজ্ঞান-সাংবাদিক গোপালচন্দ্রের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে, জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার মাধ্যমে। সেখানে পরিবেশিত বিভিন্ন সংবাদ সুনির্বাচিত, সেইকালের পক্ষে আধুনিক, সেইসঙ্গে তা স্বচ্ছন্দ এবং আড়ম্বর-হীন ভাষার কৌলীন্যে শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সক্ষম। এইসব গুণাবলী যে কোনো বিজ্ঞান-সাংবাদিকের পক্ষে আদর্শ এবং গোপালচন্দ্র তা বরাবর রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন।

এ কথা সত্য, আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এবং পটভূমির পরিবর্তনে তাঁর পরি-বেশিত বিভিন্ন সংবাদের সংশোধন এবং সম্পাদনা বিশেষ দরকার। এ কাজ সুষ্ঠু-ভাবে পালন করতে হলে সম্পাদককে মনে রাখতে হবে, তার দায়িত্বভার কিছু লঘু নয়।

কিন্তু তাতে প্রকাশিত গ্রন্থ বা গোপালচন্দ্রের কৃতিত্ব কিছুমাত্র খাটো করে দেখা উচিত হবে না।

স্মরণ রাখা উচিত, বিজ্ঞান সাংবাদিকতার ভাষা সংকলিত সংবাদের সময়কাল থেকে আজ ৪০ বছরে অনেক বদলে গেছে বলে মনে হয় না। ফলে আজও গোপালচন্দ্রের এ ধরনের রচনাকে বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার নমুনা হিসেবে ধরা চলতে পারে। আর ঠিক স্বাধীনতা উত্তর কালে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান কোথায় দাঁড়িয়ে-ছিল এখনকার পাঠক তার একটা পরিচয় পাবে, এই সংকলনের মাধ্যমে। সে পরিচয়েরও প্রয়োজন আছে। সেদিক দিয়েও সংকলনটির মূল্য কম নয়।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আনন্দমোহন কলেজ

কলিকাতা—৭০০ ০০৯

সূচি

সমুদ্র হইতে হিমালয়ের উত্থানের প্রমাণ

কাঠমণ্ডু, ১০ই জুলাই—সুইস ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ টি. টি. হুগেন সম্প্রতি হিমালয় অভিযানে ১৪ হাজার ফুট উচ্চ মুক্তিনাথ নামক চূড়ায় ২০ কোটি বৎসর পূর্বের শিলাময় এক শম্বুক আবিষ্কার করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে ব্যাপকভাবে ভূতাত্ত্বিক জরীপ সমাধা করিয়া ডাঃ হুগেন সম্প্রতি নেপালে ফিরিয়া আসিয়াছেন।
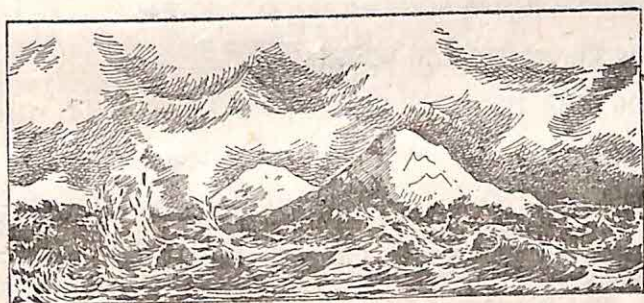
সমুদ্র থেকে হিমালয়

এত উর্ধ্বে শম্বুকাকৃতি জীবের কঙ্কাল পাওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, একদিন হিমালয় গভীর সমুদ্রতল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই সুইস ভূতত্ত্ববিদ জানাইয়াছেন যে, শিলাময় এই কঙ্কালের পরিধি তিন ইঞ্চি, ইহা প্রায় এক-চতুর্থ ইঞ্চি মোটা। এখনও ইহা অনেকটা অবিকৃত রহিয়াছে। ইহা শক্ত ও কালো হইয়া গিয়াছে।

অক্টোবর, ১৯৫২

হিমালয় কি লুপ্ত হবে ?

যে সকল ফরাসী ভূতাত্ত্বিক মাকালু শৃঙ্গ বিজয়ীদের দলে ছিলেন, তাঁহারা কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের মধ্যে প্রোফেসর বোর্দকে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, হিমালয় পর্বতমালা কি একদিন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ?

তদুত্তরে অধ্যাপক বোর্দে বলেন, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। তবে হিমালয় যদি বিলুপ্ত হয়-ও তবে দুই-এক হাজার বৎসরের মধ্যে হইবে না। এই ঘটনা ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর কাটিয়া যাইবে। আমরা নিশ্চয়ই আর ততদিন বাঁচিতেছি না। জানেন তো ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখার ভাগ্য সব মানুষের আয়ুষ্কালে ঘটে না।

তিনি বলেন যে, ধরুন এখনই যদি হিমালয়ে কোন পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, তবে তাহা ধরা পড়িতেও কয়েক লক্ষ বৎসর লাগিবে।

এই সকল ফরাসী ভূতাত্ত্বিকের মতে, হিমালয়ে একবার ভীষণ রকম ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। যাহার ফলে নীচের অংশ উপরে উঠিয়া গিয়াছে এবং উপরের অংশ নীচে চাপা পড়িয়াছে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের উপর এমন ভয়ানক প্রাকৃতিক চাপ পড়ে যে, তাহার ফলেই হয়তো সমগ্র অঞ্চল দুমড়াইয়া গিয়া হিমালয়ের অসংখ্য পর্বত শৃঙ্গের সৃষ্টি হয়। গাঙ্গেয় উপত্যকাও হয়তো সেই কারণে সমতলে পরিণত হইয়াছে

অধ্যাপক বোর্দে জানান যে, হিমালয় অঞ্চলে এই ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়তো ৩০০ হইতে ৫০০ লক্ষ বৎসর পূর্বে শুরু হয় এবং ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে সম্ভবত এইস্থানে স্থিতি আসে। একদিকে যেমন শৃঙ্গগুলি ক্রমশ উচ্চতর হইতে শুরু করে অপরদিকে তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তুষারপাত, ঝঞ্ঝা এবং আরও নানাবিধ কারণে শৃঙ্গগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে, যে হারে শৃঙ্গগুলির উচ্চতা বৃদ্ধি হইতেছে, তদপেক্ষা অধিক দ্রুতগতিতে ঐগুলির ক্ষয় হইতেছে।

ফরাসী ভূতাত্ত্বিক বলেন যে, এই প্রথমবার তাঁহারা মাকালু পর্বতের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রস্তুতকার্যে ব্রতী হইবেন। এই অভিযানে এই সম্পর্কে যথোপযুক্ত মালমসলা, সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা জানান।

তাঁহারা আরও জানান যে, মাকালু পর্বত গ্রানাইট প্রস্তরে গঠিত। মাকালুই বোধ হয় বিশ্বের গ্রানাইটে গঠিত সর্বোচ্চ পর্বত বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহারা জানান যে, এই অভিযানে তাঁহারা প্রায় ৪০০ বিভিন্ন ধরনের প্রস্তরের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন। মাকালুর উপরে প্রস্তরীভূত শিলা তাঁহাদের নজরে পড়ে নাই। [১৯৫৫ সালে জীন ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে গঠিত ফরাসী অভিযাত্রী দল ২৭,৭৯০ ফুট উচ্চ মাকালু শৃঙ্গ আরোহণ করেছিলেন]।

জুলাই, ১৯৫৫

প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপের আবির্ভাব

নিউ ওয়েস্টমিনস্টার (বৃটিশ কলম্বিয়া), ১লা জুন গত মাসে প্রশান্ত মহাসাগর গর্ভ হইতে গ্লাসগোর একটি মালবাহী জাহাজের লোকেরা একটি দ্বীপ ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়াছে। 'কুইন আনা' (৭০৬৩ টন) এর তৃতীয় অফিসার নীল. এস. জ্যামিসন বলিয়াছেন যে, গত ৮ই মে অপরাহ্নে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত লুজন দ্বীপের উত্তর প্রান্তস্থিত এনগানো অন্তরীপ হইতে অনুমান ২০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর গর্ভে আগ্নেয়গিরি হইতে তিনি একটি দ্বীপ ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়াছেন। প্রথমে দূর হইতে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ হইতে ঝড়ের মত দ্বীপটিকে উপরের দিকে উঠিতে দেখা যায়। পাঁচ মাইল দূর হইতে দেখা গেল—সমুদ্র হইতে যেন এক হাজার ফুট উচ্চ একটি পাহাড় ভাসিয়া উঠিল। জ্যামিসনের অনুমান দ্বীপটি প্রস্থে এক

মাইলের চার ভাগের তিন ভাগ হইবে। এই অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরে কয়েকটি দ্বীপ এইভাবে ভাসিয়া উঠিতে এবং পরে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

জুলাই, ১৯৫২

স্ট্রম্বলি আগ্নেয়গিরির নিদ্রাভঙ্গ

স্ট্রম্বলি, ৭ই জুন—সিসিলির উত্তর-পূর্বে অবস্থিত স্ট্রম্বলি দ্বীপের আগ্নেয়-গিরি আজ ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। শ্বেতবর্ণ উত্তপ্ত লাভা স্ট্রম্বলি গিরি-মুখের তিনটি রন্ধ্র হইতে প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইয়া গিরিগাত্র বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। দেখিতে আঠার মত ঐ উত্তপ্ত বস্তু যেখানে পড়িতেছে, সেখানেই সমুদ্রজল সশব্দে বাষ্প উদ্গীরণ করিতেছে। স্ট্রম্বলি দ্বীপের ১২ হাজার অধিবাসী লাভাস্রোত হইতে পূর্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে বাস করে। তাহারা উদ্বিগ্নচিত্তে রাস্তায় জড়ো হইতেছে কিংবা গির্জায় গিয়া প্রার্থনা করিতেছে।

ধূসর কৃষ্ণাভ লাভাভস্ম উড়িয়া গিয়া তুষারের মত দ্বীপময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে অগ্নিবর্ণ লাভাখণ্ড সশব্দে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। এ পর্যন্ত কোন ক্ষতি বা হতাহতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই দ্বীপের বেশীর ভাগ অধিবাসীই জেলে, যদি আরও জোরে লাভাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সপরিবারে নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাওয়ার জন্য তাহারা সমুদ্রসৈকতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

জুলাই, ১৯৫২

নূতনতম আগ্নেয়গিরি

স্যানডিয়েগো (ক্যালিফোর্নিয়া), ১৫ই সেপ্টেম্বর—বিশ্বের নূতনতম আগ্নেয়গিরির মেক্সিকোর অনধ্যুষিত স্যান বেনিডিকটো দ্বীপে প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং গ্যাস উদগীরণ করিতেছে। এই দ্বীপটি স্যান ডিয়েগো-র সাড়ে সাত শত মাইল দক্ষিণে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। স্যান ডিয়েগোর বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ রবার্ট ডিরেৎস এই আগ্নেয়গিরির উপর দিয়া বিমানযোগে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলেন যে, এই আগ্নেয়গিরি হইতে যেভাবে ধূম ও গ্যাস উদ্গীরিত হইতেছে, তাহার গুরুত্ব বৈজ্ঞানিক দিক হইতে খুবই বেশী। তিনি বলেন যে, এই আগ্নেয়গিরি হইতে তীব্র বিস্ফোরণের পর
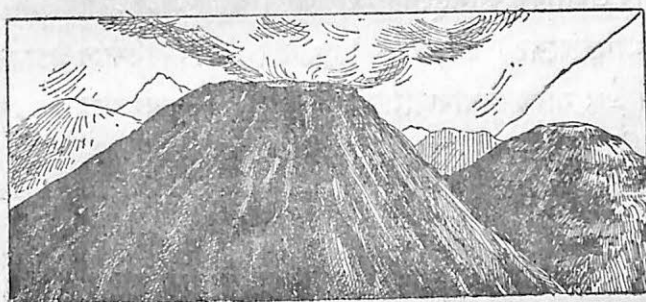
আগ্নেয়গিরি

যে ধূম্রজালের সৃষ্টি হইতেছে তাহা হইতে হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে ; এই গন্ধ অনেকটা পচা ডিমের গন্ধের মত। ডাঃ ডিরেৎস বলেন যে, এই হাইড্রোজেন সালফাইডের অস্তিত্ব হইতে মনে হয় যে, বিস্ফোরণের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাইবে এবং হয়ত আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হইবে। গত দেড় মাসে অগ্নি উদ্গীরণের ফলে মোচার আকারে প্রায় এক হাজার পঞ্চাশ ফুট উঁচু হইয়া ছাই জমিয়া উঠিয়াছে।

অক্টোবর, ১৯৫২

বারো শত বৎসরের প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির

রায়পুর হইতে ৪৫ মাইল দূরে সিরপুর গ্রামের নিকট মাটি খনন করিয়া [১৯৫৫] বারো শত বৎসরের পুরাতন একটি বৌদ্ধ মন্দির এবং সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট বেলে পাথরে নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধ্বংসস্তূপের উপর দণ্ডায়মান তুইটি দ্বারপালের মূর্তি দেখিয়া সর্বপ্রথম মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

পুরাতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, পাণ্ডব নৃপতি মহাশিবগুপ্ত ওরফে বালার্জুন এই বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করিয়া থাকিতে পারেন।

মন্দিরের স্থাপত্য ও গঠন এবং অন্যান্য কয়েকটি চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় যে, মন্দিরটি গুপ্তোত্তর যুগে নির্মিত হয়। তুই সহস্রের অধিক গৃহস্থালীর দ্রব্যাদিও ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের [তৎকালীন] মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লের অনুরোধে এবং সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে খননকার্য আরম্ভ হয়। মিঃ এম. জি. দীক্ষিত খননকার্য তত্ত্বাবধান করেন।

জানুয়ারী, ১৯৫৫

ঝাঁসিতে অশোকের নতুন শিলালিপি আবিষ্কৃত

ঝাঁসি, ৩রা জানুয়ারী [১৯৫৫]—শ্রী লালচন্দ্র ও শ্রী লখপত রাম শর্মার প্রচেষ্টায় মহারাজ অশোকের এক নূতন শিলালিপি দাতিয়া-ঝাঁসির প্রান্তে তাজরা গ্রামের নিকট এক গভীর জঙ্গলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ড প্রায় ১৫ ফুট লম্বা ও ৬ ফুট চওড়া। প্রায় ১২ ফুট লম্বা ৬ লাইন লিপি পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মীলিপি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে বিশেষজ্ঞরা পাঠ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি অক্ষর প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া ও গভীর।

বুন্দেলখণ্ডে দুই হাজার বৎসর পর দেবতার প্রিয়, প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের বাণী পুনরায় আবিষ্কৃত হইল। হায়দরাবাদের মাস্কী শিলালিপি ছাড়া অন্য কোন শিলালিপিতে মহারাজ অশোকের নাম পাওয়া যায় নাই। রাজস্থানের বৈরাট ও মধ্যপ্রদেশের রূপনাথ শিলালিপির মাঝে বর্তমান লিপি এক যোগসূত্র স্থাপন করিতেছে। বর্তমান শিলালিপির আরম্ভ এইরূপ—"দেবনাম পিয়াসা পিয়দশশিশনো অশোক রাজসা…" এই শিলালিপিতে মহারাজ অশোকের তীর্থযাত্রার বিবরণ রহিয়াছে। মর্মার্থ এইরূপ—"আমি বুদ্ধের শরণ লইয়া ২৫৬ দিন বুদ্ধের বাণী নানাস্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। আমি প্রায় তিন বৎসর জনকল্যাণের চেষ্টা করিতেছি, এ কার্যে সকলেরই সহায়তা ও সহযোগিতা আবশ্যক।" প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে ডাঃ বালচন্দ্র ছাবড়া, ডাঃ পুরী ফোটোগ্রাফার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রস্তরলিপি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

জানুয়ারী, ১৯৫৫

অশ্বমেধ যজ্ঞের স্থান খনন

নয়াদিল্লী—ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উত্তর প্রদেশের দেরাদুন জেলায় অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আরও একটি স্থান খনন করা হইয়াছে। এবার যে স্থানটি খনন করা হইয়াছে, তাহা দেরাদুন হইতে ৩৬ মাইল দূরে যমুনা নদীর উপরে কলসী নামক স্থানের নিকট অবস্থিত। এই পর্যন্ত গরুড়াকৃতি একটি মূর্তি খোদাই করা ৮টি ইট পাওয়া গিয়াছে। এগুলিতে যে লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, পোন বংশের এবং বৃষগণ গোত্রের রাজা শিলাবর্মণ এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞবেদী হইতে ঐ ইটগুলি পাওয়া গিয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা শ্রীযুক্ত টি. এন. রামচন্দ্রণের তত্ত্বা-

বধানে এই খননকার্য চলিতেছে। কয়েকজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন।

এই সকল খননকার্যের ফলে অনেক শতাব্দী আগেকার এক আড়ম্বরপূর্ণ বৈদিক অনুষ্ঠানের নূতন করিয়া পরিচয় পাওয়া যাইবে। আর পাওয়া যাইবে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের এক প্রতাপান্বিত রাজার পরিচয়, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—অথচ ইতিহাস যাঁহার সম্বন্ধে এতাবৎ নির্বাক আছে।

বর্ষাগমের পূর্বেই যাহাতে এই খননকার্য শেষ করা হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে।

মে, ১৯৫৫

সোয়াশত বৎসর পূর্বের ডায়েরী

লক্ষ্ণৌয়ের খবরে প্রকাশ—কয়েকমাস পূর্ব হইতে নবাব আসগর হোসেন পুরাতন লক্ষ্ণৌর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সাংবাদিকগণকে ১৩৩২ হিজরী সনের (১৮২০ খৃষ্টাব্দের) একখানা ডায়েরীর পাণ্ডুলিপি প্রদর্শন করেন। জাফরদ্দৌলা ফতে আলি খান এবং তাঁহার পৌত্র মুএতাদ্দৌলা খানের নাম এই ডায়েরীর লেখক হিসাবে রহিয়াছে। ইঁহারা অযোধ্যার রাজা সাদাত আলী খানের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। নবাব আসগর হোসেন বলেন যে, তিনি এই ডায়েরীখানা স্থানীয় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিকট পাইয়াছেন। এই ডায়েরীখানার উপরে 'গোপন' কথাটি লিখিত আছে এবং ইহাতে একটি আরবীয় শীলমোহর, কয়েকটি নক্সা ও পাঁচ প্রকারের সাঙ্কেতিক লিপি আছে।

নবাব শীঘ্রই গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য পুনরায় খননকার্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া সাংবাদিকগণকে জানাইয়াছেন।

মে, ১৯৫৫

রাজা হেরোডের প্রাসাদ

জেরুসালেম—প্রকাশ যে, যীশুখৃষ্টের জন্মকালে যে রাজা হেরোড ইহুদী-দিগকে শাসন করিতেন, তাঁহার দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পুরাতাত্ত্বিকগণ খনন করিয়া বাহির করিয়াছেন। মর্মর সাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী ইহুদীদের প্রাচীন মাসাদা দুর্গের অবস্থান-ক্ষেত্র খনন করিয়া এই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বাহির করা হইয়াছে।

ইস্রায়েলী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় খননকার্য চালাইয়া ইহুদী লেখক জোসেফাস ফ্লেভিয়াসের প্রথম শতকের রচনাবলীতে উল্লিখিত সর্পিল পথ প্রথম আবিষ্কার করা হয়। এই প্রাচীন লেখক ইহুদীদের পুরাতাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। পাহাড়ের উপর অবস্থিত দুর্গে যে দুইটি আঁকাবাঁকা পথ গিয়াছে, সর্পিল পথকে তাহার অন্যতম পথরূপে ফ্লেভিয়াস উল্লেখ করিয়াছেন।

ফ্লেভিয়াস লিখিয়াছেন যে, রাজা হেরোড কতকটা তাঁহার বিদ্রোহী প্রজাদের বিরুদ্ধে এবং কতকটা মিশরীয় রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারূপে মাসাদাকে দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন।

মে, ১৯৫৫

মিশরে নূতন পিরামিড

সাকারা—কায়রোর ১৬ মাইল দূরে সাকারার মাটির তলায় এক নূতন পিরামিডের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এই পিরামিড ৪,৭০০ বছরের পুরাতন তৃতীয় রাজবংশের শাসনকালের।

মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ জ্যাকেরিয়া গোনিম এই নূতন পিরামিড আবিষ্কার করেন এবং তিনিই খননকার্য চালাইতেছেন। খননকার্য দেখিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদেরাও এখানে

সমবেত হইয়াছেন।

পিরামিডে যাওয়ার ভূগর্ভস্থ পথের সূচনায় গজদন্ত নির্মিত একখানা ফলকের উপর 'জেসেতি আখি' এই নাম দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে এই নাম তৃতীয় রাজবংশের, এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত একজন ফ্যারাওর। ডঃ গোনিমের ধারণা যে, এই সম্রাটের শব পিরামিডের কোথাও সমাহিত আছে।
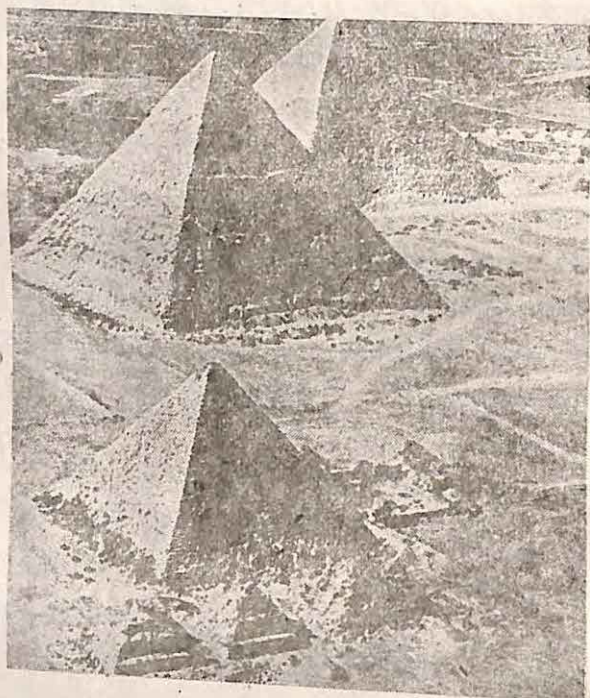
পিরামিড

যে পথ দিয়া এই ভূগর্ভস্থ পিরামিডে পৌছিতে হয়, তাহা ২২৮ ফুট লম্বা গ্রেট পাথর কাটিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই পথের নীচ দিয়া আরও একটা দক্ষিণগামী পথ রহিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা যে, এই পথের প্রান্তে এমন এক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে, যাহার

সহিত টুটেনখামেনের রত্নভাণ্ডার আবিষ্কারের সহিতই কেবলমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, এই পিরামিডটার নির্মাণকার্য অসমাপ্তভাবেই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যদি উহা শেষ করা হইত, তাহা হইলে উহার উচ্চতা আনুমানিক ২৩৭ ফুট হইত।

পিরামিডের মধ্যস্থলে যেখানে ভূগর্ভস্থ পথের শেষ হইয়াছে, সেখানে একটা অন্ধকার কক্ষ দেখা যায়। এই কক্ষের মধ্যে স্বর্ণনির্মিত শূন্য শবাধার পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু ডাঃ গোনিমের ধারণা এই যে, এই শবাধার সম্ভবত আসল অন্ত্যেষ্টির পূর্বেকার এক নকল অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হইতেছে, মৃত্যুর পর রাজার নবজীবন লাভ।

ডাঃ গোনিম মনে করেন যে, পিরামিডের কোথাও ফ্যারাওর 'মমি' রহিয়াছে। এইজন্য তিনি অক্লান্তভাবে খননকার্য চালাইয়া যাইতেছেন।

মে, ১৯৫৫

কাম্বোডিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি

কাম্বোডিয়ার গহন অরণ্যে হিন্দু সভ্যতার রমণীয় নিদর্শন সহস্র বৎসরের পুরাতন নগরী এঙ্কোরভাট ভারতের প্রাচীন ঔপনিবেশিক সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে। এঙ্কোরভাটের স্থাপত্যকলার কারুকার্য ও নগর পত্তনের কলা-কৌশল প্রাচীন যুগের ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতি ও উন্নয়ন সৌকর্যেরই পরিচায়ক। সম্প্রতি ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই সমৃদ্ধ নগরী এঙ্কোরভাটের পার্শ্ববর্তী পশ্চিম বারাই সরোবরের জলের নীচে আরেকটি বিস্মৃত নগরীর চিহ্ন অবিষ্কার করিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, এই

নগরীর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইলে ইন্দোচীনে হিন্দু সভ্যতার আর একটি নিদর্শন পাওয়া যাইবে এবং সম্ভবত এই নগরীটি এঙ্কোরভাট অপেক্ষাও পুরাতন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এঙ্কোরভাটের লুপ্ত নগরী আবিষ্কার করেন। বর্তমানে তাঁহারা যে জলমগ্ন নগরীর ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধারের কাজে হাত দিয়াছেন, তাহার জন্য ইন্দোচীনের উপনিবেশত্যাগী ফরাসী বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে। ফরাসী গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। জলের নীচে ব্যবহারের উপযোগী পোসাক-পরিচ্ছদ, পন্টুন, নৌকা এবং উচ্চশক্তিসম্পন্ন জলনিষ্কাশন যন্ত্র লইয়া ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা মহাবিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আগামী শীতকালে এই জলমগ্ন নগরীর উদ্ধারে পূর্ণোদ্যমে অভিযান চালাইবেন। ফরাসী গবেষকেরা মনে করেন, এই জলমগ্ন নগরী আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন কম্বোজে সহস্র বৎসর পূর্বে রাজা সূর্য বর্মণের রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতি এঙ্কোরভাট বিষ্ণু মন্দির নির্মাণের দ্বারা যে স্বতন্ত্র ক্মের (কাম্বোডিয়া) সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিল তাহার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইবে। কাম্বোডিয়ার এই গহন অরণ্যে নবম শতাব্দীতে নির্মিত বিরাট প্রস্তর সৌধ আবিষ্কৃত হইলেও ইহার পূর্বযুগের কোন চিহ্নই এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণা হইতে জানা যায় যে, ক্মের জাতি প্রস্তর ব্যবহারের পূর্বে কাঠের ব্যবহার শিখিয়াছিল। কাষ্ঠ নির্মিত পূর্বতন সে সমস্ত গৃহাদি সম্ভবত ভস্মীভূত হইয়াছে, নতুবা কাল প্রবাহে ঘুণে ধরিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিম বারাই সরোবরের নিম্নে জলমগ্ন এই লুপ্ত নগরী সম্ভবত খৃষ্টীয় ৮ম শতকে নির্মিত হইয়াছিল। এই নগরী নির্মাণে ক্মের জাতির প্রাক্ প্রস্তর যুগের কাঠের ও আনুষঙ্গিক কাজের চিহ্নাদি নিশ্চিতই এখনও পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, বিজ্ঞানের সহায়তায় প্রথম অনুসন্ধানকারী দল জলের নীচে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ

পর্যবেক্ষণ করিতে যাইবেন। যদি তাঁহারা উল্লেখযোগ্য কিছু আছে বলিয়া মনে করেন তবে এই সরোবরের জল নিষ্কাশন করিয়া পূর্ণোদ্যমে অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হইবে। আশা করা যায়, বর্তমান পরিকল্পনানুযায়ী খননকার্য অগ্রসর হইতে থাকিলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে কাম্বোডিয়ার প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির সুরম্য নিদর্শন এঙ্কোরভাটের আরও অনাবিষ্কৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, ক্মের নৃপতিবর্গ তাঁহাদের রাজত্বকালে এই বিরাট মন্দিরাদি এবং নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই নগর নির্মাণ ও সংরক্ষণে ক্মের নৃপতিবর্গ যুদ্ধবন্দী দাস-শ্রমিকদের নিয়োগ করিতেন। শ্যাম, ভিয়েৎনাম এবং মালয়ে এই নৃপতিবর্গের বিজয়ী সৈন্যদল হাজার হাজার দাসকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিত। এঙ্কোরভাটের মন্দিরে নৃত্য-গীত ও সন্ধ্যারতি করিবার উদ্দেশ্যে শত শত দেবদাসীও আনা হইত। বিজিত দেশ হইতে ধনরত্নাদি মন্দিরের স্বর্ণগম্বুজের জন্য আনা হইত।

১৩৪২ খৃষ্টাব্দে ক্মের নৃপতিরা তাঁহাদের রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কাজেই তাঁহাদের পক্ষে তখন এই বিরাট ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব ছিল না। ইহার আগের বৎসরেই শ্যামের হানাদারেরা এঙ্কোরভাট অধিকার করিয়া তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ক্মের নৃপতিরা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় দরিদ্র কৃষক শ্রেণী বেগার খাটিবার কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছিল। ক্মেরের নূতন রাজধানী তৈরী হইয়াছিল নমপেনে।

সহস্র বৎসর পূর্বে এঙ্কোরভাটের এই বিরাট ঐশ্বর্য সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখনও অনুসন্ধান চালাইতেছেন। ইতিহাস হইতে জানা যায়, রাজা সূর্য বর্মণ ১১১২-১১৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বকালে এই নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এঙ্কোরভাটের অর্থ—সূর্যমন্দির। রাজা সূর্য বর্মণ ছিলেন পরম বৈষ্ণব, তাঁহার উপাধি ছিল পরমবিষ্ণুলোক। এঙ্কোরভাট মন্দিরের নির্মাণকার্য তাঁহার রাজত্বকালে আরম্ভ হইলেও

শেষ হইয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পরে। মন্দিরের অনেক অংশ এখনও অসম্পূর্ণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ক্মেরে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব শুরু হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই সেখানে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। এঙ্কোরভাট এক পরমাশ্চর্য স্থাপত্যকলার নিদর্শন। মন্দিরগাত্রে হিন্দুধর্ম ও সাংস্কৃতিক চিত্রকাহিনী খোদিত, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও পৌরাণিক কাহিনী মন্দিরগাত্রে শোভিত। এতদ্ব্যতীত নিত্যকার জীবনযাত্রার কাহিনীও ক্মের শিল্পীরা দক্ষতার সহিত মন্দিরগাত্রে খোদাই করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। জলমগ্ন এই লুপ্ত নগরীর উদ্ধার হইলে ক্মের জাতির আরও নৈপুণ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এই লুপ্ত নগরীর উদ্ধারকার্যে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পরম উৎসাহে কাজে লাগিয়াছেন। দুইটি স্থানান্তরযোগ্য ক্রেন, চারটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন স্ক্রুজ্যাকস্, দশটি স্ট্যাকার, জেনারেটর, সার্চলাইট, পণ্টুন নৌকা, জলে নামবার পোসাক, ট্রাক ইত্যাদি লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইবে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাফুয়নের বিখ্যাত পুরামিদ মন্দিরেরও পুনর্নির্মাণ করা হইবে। এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল খৃষ্টীয় ১০৫০ সালে। এই মন্দিরটি তৃতীয় এঙ্কোর মন্দিরের কেন্দ্রস্বরূপ। সর্বশেষ নগরী এঙ্কোরটম নির্মাণের পূর্বেই এইটি নির্মিত হইয়াছিল। আরও যে কয়টি মন্দিরের সংস্কারকার্যে হাত দেওয়া হইবে সেইগুলি হইল পুণ্য তরবারি মন্দির, থমনেজ মন্দির ও গ্রন্থাগার, শ্রী শাং সৌধ এবং সর্পমন্দির।

ইন্দোচীনের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের অন্তরালে ঔপনিবেশিক ফরাসীর বিদায়ের পাশাপাশি চলিয়াছে সত্যসন্ধানী অন্য এক ফরাসী জাতির একনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ব্রত উদ্‌যাপন। সেখানে জাতির সীমানা কোন বাধা-নিষেধ সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

সাড়ে সতের কোটি বৎসর পূর্বের সরীসৃপ

ব্লুম ফর্কের সংবাদে জানা যায়—প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক ডাঃ ফ্রান্সিস এলেনবার্গ এমন একটি সরীসৃপের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল খুঁজিয়া পাইয়াছেন, যাহা সাড়ে সতের কোটি বৎসর পূর্বে এ পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইত।
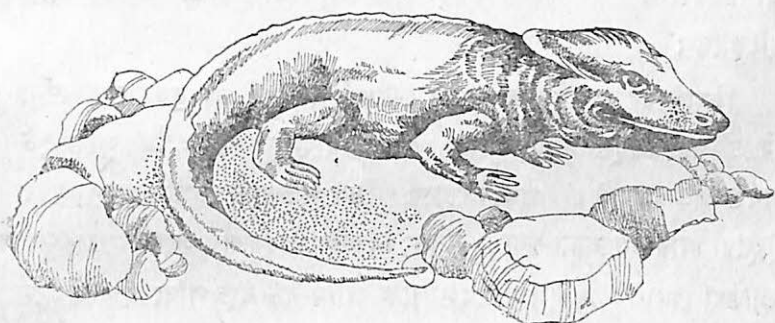
দক্ষিণ পশ্চিম বাস্থটোল্যাণ্ডের একটি স্থানে মৃত্তিকার দেড় ফুট অভ্যন্তরে হাড়গুলি প্রোথিত ছিল। ভূতাত্ত্বিক এই পর্যন্ত ৫ খানা অস্থি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। সেগুলি এখনও বেশ ভাল অবস্থায় রহিয়াছে।

অক্টোবর, ১৯৫৫

রূপকুণ্ডের নরকঙ্কাল

হিমালয়ের উর্ধ্বদেশে রূপকুণ্ড হ্রদের তুষারাস্তীর্ণ তীরে অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি, হাড়ের টুক্‌রা আর মাংস-জড়ানো নরকঙ্কাল ইতস্তত পড়িয়া রহিয়াছে।

সাতদিনের প্রাণান্তকর চেষ্টায় রয়টারের সংবাদ দাতা শ্রী ডি. এম. নায়ার রূপকুণ্ডে গিয়া স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন যে—এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত পাদুকাগুলি আর গহনাপত্র দেখিয়া

মনে হয় অকস্মাৎ পাহাড়ের ধ্বস আর বরফের স্তূপ স্খলিত হইবার ফলে একদল তীর্থ-যাত্রীর এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে। তীর্থযাত্রীর দলে শিশু, নারী ও পুরুষ মিলাইয়া আন্দাজ দুইশত জন লোক ছিল। ঘটনাটি সম্ভবত কয়েক শতাব্দী আগেকার।

রূপকুণ্ডের পথে শেষ গ্রাম ওয়ান-এর আশি বৎসরের এক বৃদ্ধ জানান যে, শত শত বৎসর ধরিয়া এইগুলি ওখানে ঐ ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

হিমালয়ের ১৮ হাজার ফুট উর্ধ্বে অবস্থিত এই হ্রদতীরের বর্ণনা দিতে গিয়া শ্রীযুক্ত নায়ার বলেন, প্রায় হামাগুড়ি দিয়া আমি কুড়ি ফুট পর্যন্ত নামিয়া যাই। প্রথমে চোখে পড়িল শত শত ছোট-বড় পাথরের টুক্‌রো আর বহু খানা-খন্দ। কিন্তু নিকটবর্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভুল ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, যেগুলিকে আমি বড় বড় পাথরের খন্দ মনে করিয়াছিলাম আসলে সেগুলি মানুষের মাথার খুলি। যেগুলিকে আমি জ্বালানি কাঠ বলিয়া ভাবিয়াছিলাম—আসলে সেগুলি মানুষের শরীরের হাড়-পাঁজর। চতুর্দিক স্তব্ধ এবং নির্জন, তাহার উপর কুয়াশার ঘোর আর চোখের সামনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষের মাথার খুলি, হাড়-পাঁজর, নরকঙ্কাল—কেমন একটা যেন অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। সঙ্গের কুলীরা কিছুতেই আমার সহিত নামিয়া আসিতে রাজী হইল না।

হ্রদের পূর্ব ও দক্ষিণ তীরে চোখে পড়িল বহু নরকঙ্কাল পাথর ও বরফে আধা-সমাধিস্থ অবস্থায় রহিয়াছে। কোন কোন কঙ্কালের গায়ে এখনও শীর্ণ-বিশীর্ণ মাংস জড়াইয়া রহিয়াছে। আরেক জায়গায় গুনিয়া দেখিলাম, চল্লিশটি মাথার খুলি, ইহা ছাড়া, চারিপাশে মানুষের হাড়ের অসংখ্য টুক্‌রা তো ছড়াইয়া রহিয়াছেই! কোথাও বা এক একটি অস্থির কঙ্কালের এক আধখানা মাটিতে গাঁথিয়া গিয়া বাকী আধখানা আকাশের দিকে উচাইয়া রহিয়াছে—সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

তীর্থযাত্রীরা যে ধরণের বাঁশের লাঠি ব্যবহার করিয়া থাকে—সেই

রকম বহু লাঠি চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। আগেকার দিনে মেয়েরা যে রকম বালা পরিতেন, তাহারও কয়েকটি স্তূপীকৃত হাড়ের পাশে এক স্থানে চোখে পড়িল। আগেকার দিনে ব্যবহৃত চর্মপাছকার অনেকগুলি নিদর্শনও দেখা গেল। কুলীরা যে ঝুড়ি বহিয়া বেড়ায়, বরফের মধ্যে সেই রকম কয়েকটি ঝুড়িও দেখিলাম। আরও দেখিলাম, মানুষের একটি ধড়-মাথা নাই, পা-ও নাই—উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

তীর্থযাত্রী দলটির উপর যে প্রকৃতির অভিশাপ অকস্মাৎ নামিয়া আসে—সর্বত্র তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট। মাথার খুলি ইত্যাদি দেখিয়া বোঝা যায়, অন্তত তুইশত জনকে ইহার ফলে মর্মান্তিক অপমৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। এত বড় তুর্ঘটনা হিমালয়ে আর ঘটে নাই।

এই হ্রদটি হিন্দুদের অতি পবিত্র স্থান। তীর্থযাত্রীরা সম্ভবত কৈলাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে এখানে আসিয়াছিলেন।

কুলীরা শ্রীযুক্ত নায়ারকে একটি কঙ্কাল বা সামান্য একটা হাড়ের টুক্‌রা পর্যন্ত লইয়া আসিতে দেয় নাই। তাহাদের বিশ্বাস—ওখান হইতে হাড় অপসারণ করিলে ভূত তাহাদের প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। তবে তুইটি বালা আর একটি বাঁশের ছড়ি লইয়া আসিতে তাহারা মত দেয়।

ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ দত্ত মজুমদার কলিকাতায় প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার জনৈক প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, হিমালয়ের ১৮ হাজার ফুট উর্ধ্বে তুষারাবৃত রূপকুণ্ড হ্রদে যে সকল নরকঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে সেগুলি বৃহৎ কোন তীর্থযাত্রী দলের। তিনি আরও বলেন যে, এইসব কঙ্কাল যে কাশ্মীরের জেনারেল জরোয়ার সিং-এর অধীনস্থ সেনা দলের নহে, তাহা মোটামুটি নিশ্চিন্তভাবেই বলা যাইতে পারে।

ডাঃ দত্ত মজুমদার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শতাধিক বৎসর আগে রূপকুণ্ড হ্রদে এই মর্মান্তিক তুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া নানারূপ অনুমান করা হইতেছে। কিন্তু এই সব অনুমান ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়; তুর্ঘটনাটি নিশ্চয়ই আরও বহু আগে ঘটিয়াছিল।

ডাঃ দত্ত মজুমদার বলেন, প্রথমেই আমার ধারণা হয় যে, কঙ্কাল-গুলি তীর্থযাত্রীদের। আমার ধারণা এই কারণে পরে সত্য বলিয়া মনে হয় যে, রূপকুণ্ড হ্রদটি ত্রিশূল শৃঙ্গের পাদদেশস্থিত একটি প্রাচীন তীর্থস্থানের পথে পড়ে। বর্তমানে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, কঙ্কালগুলি তীর্থ-যাত্রীদেরই—জেনারেল জরোয়ারের অধীনস্থ সৈন্যদলের নয়। স্থানীয় অঞ্চলসমূহে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসরে নন্দা-জাট (নন্দা দেবীর সম্মানার্থে মিছিল) নামে তীর্থযাত্রীদের মিছিল বাহির হয়। ১৯২৫ সালে এইরূপ একটি মিছিল বাহির হইয়াছিল। সেই সময় গারোয়ালের বনবিভাগীয় জনৈক কর্মচারী সর্বপ্রথম কঙ্কালগুলি দেখিতে পান। নন্দা দেবীর শোভাযাত্রা সর্বশেষ বাহির হয় ১৯৫১ সালে ; অর্থাৎ ২৬ বছর পর। কিন্তু প্রবল তুষার ঝঞ্ঝার দরুণ মিছিলটি ত্রিশূল শৃঙ্গে পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই।

রূপকুণ্ড হ্রদের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নৃতত্ত্ব বিভাগ ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। সঠিক কোন অঞ্চল হইতে তীর্থযাত্রীরা আসিয়াছিল, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার।

অক্টোবর, ১৯৫৫

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর যক্ষিণী মূর্তি

বেশনগরের (যেখানে প্রাচীন বিদিশানগরী ছিল) নিকটে বেতোয়া নদীর গর্ভে সাত ফুট উচ্চ একটি যক্ষিণী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মধ্য ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর বলিয়াছেন যে, এই যক্ষিণী মূর্তি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। বেশনগরে প্রাপ্ত আর একটি যক্ষিণী মূর্তি এখন কলিকাতা যাদুঘরে আছে। ৬।৭ বৎসর পূর্বে আর একটি

যক্ষিণী মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় ভিলসায় পাওয়া যায়। ভিলসা বেশনগর হইতে দুই মাইল দূরে। ঐ ভগ্ন মূর্তি গোয়ালিয়র যাদুঘরে আছে। বর্তমানে যে মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা তিন টুক্‌রা অবস্থায় ছিল। আর একটি ১১ ফুট উচ্চ মূর্তি জলমগ্ন রহিয়াছে। সমগ্র ভারতে এই শ্রেণীর মূর্তি সংখ্যায় ১০।১২টির বেশী হইবে না। তন্মধ্যে তিনটিই পাওয়া গিয়াছে বেশনগরে। এই মূর্তিগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব যথেষ্ট।

জুলাই, ১৯৫২

নিপ্পুরে প্রাচীন মন্দির আবিষ্কৃত

শিকাগো ও পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নিপ্পুরে (ইরাক) চার হাজার বৎসরাধিক পূর্বের দুইটি মন্দির আবিষ্কৃত হওয়ার সংবাদ জানাইয়াছেন। এই সঙ্গে দুইশত খোদিত লিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমিত হইতেছে, ঐগুলি বিশ্বের অন্যতম পুরাতন ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণী।

জুলাই, ১৯৫২

প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর নির্মিত কুঠার

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজল ঘাটি থানার অন্তর্গত বনআশুরিয়া গ্রামে এক চমকপ্রদ আবিষ্কারের ফলে বাংলার খ্রীষ্টপূর্ব ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার শতাব্দীর প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।

উক্ত গ্রামের একটি স্থানে ৩ ফুট মাটির নীচে ১০টি প্রস্তর নির্মিত

কুঠার পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

বনআশুরিয়া গ্রামের শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার জমিতে কৃষির উন্নতি করিতে গিয়া ঐ সকল প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রের সন্ধান পান। যে কুঠারখানি আশুতোষ মিউজিয়মে রাখা হইয়াছে। তাহা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বিস্তারে ১০″ × ২½″ × ১½″ ইঞ্চি। আশুতোষ মিউজিয়মের কিউরেটর ডাঃ ডি. পি. ঘোষ এই সম্পর্কে বলেন যে, কুঠারখানি 'ডায়োরাইট' (এক প্রকার আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত প্রস্তর) প্রস্তরে নির্মিত। উহার প্রান্তভাগ ঈষৎ বক্র এবং বেশ ধারাল। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, উল্লিখিত অস্ত্র ইউরোপের নিওলিথিক (নবপ্রস্তর যুগ) যুগের প্রান্ত ক্যাপনিয়ান কুঠারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ডাঃ ঘোষ জানান যে পূর্বে উড়িষ্যা ও সিংভূমে এই ধরনের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন, এই আবিষ্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামগ্রী না পাওয়া পর্যন্ত উহা প্রস্তরযুগের কিনা, তৎসম্পর্কে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুসন্ধান পরিচালিত হইলে উল্লিখিত স্থানে বাংলার প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

জুলাই, ১৯৫২

বিশ্বের প্রাচীনতম নগরী

লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ ৪৫ বৎসর বয়স্কা মহিলা প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্যাথলিন মেরি কেনিয়ন প্রত্নতত্ত্ববিদদের এক সভায় বলেন যে, সম্প্রতি খননকার্যের ফলে দেখা গিয়াছে যে, জেরিকো-ই সম্ভবত বিশ্বের প্রাচীনতম নগরী। মিস কেনিয়ন গত শীতকালে জেরিকো আবিষ্কারের

অভিযান পরিচালনা করেন। কয়েক সপ্তাহ খননকার্য চালানোর পর তাঁহারা জেরিকো নগরীর চতুষ্পার্শে পর পর প্রাচীরের ৭টি স্তর দেখিতে পাইয়াছেন। এই প্রাচীর প্রথম ব্রোঞ্জ যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় সবে মাত্র নগরী গড়িয়া উঠিতে থাকে তখন জেরিকোয় পুরাদস্তুর নগর বিদ্যমান ছিল। জেরিকো প্যালেস্টাইনের অধুনালুপ্ত এক প্রাচীন নগরী।

অক্টোবর, ১৯৫২

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

হুগলী জেলার সদর মহকুমার পোলবা থানার অন্তর্গত মহানাদ-রামকৃষ্ণ-নগর কলোনীর বিভিন্ন স্থানে গৃহাদি নির্মাণের জন্য খননকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় গুপ্ত যুগে প্রচলিত মৃন্ময় পাত্র, প্রদীপ, ঢাকনি, ছাঁচ এবং কদলী ছড়া, পাঠান ও মোগল আমলে প্রচলিত রঙীন মৃৎপাত্রখণ্ড এবং মোগল আমলের চারিটি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কলোনীতে একটি প্রস্তরময় ভগ্ন মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তি, একটি পাদপীঠ, কতিপয় প্রস্তর-ফলক এবং কলোনীর সন্নিকটে এক প্রস্তরময় ভগ্ন অনন্তশয্যা-মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এইগুলি পাল যুগের নিদর্শন।

গত ৮ই জুলাই সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব ভারতীয় কেন্দ্রের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীশশধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহানাদ পরিদর্শন করেন এবং শ্রীযুক্ত পালের নিকট হইতে মৃন্ময় দ্রব্যগুলি ও মুদ্রাগুলি যাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ করেন।

মগরা থানার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের এক স্থানে কতিপয় প্রস্তর-ফলকাদি এবং একটি ক্ষুদ্র স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পাল এই

স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি উক্ত স্থানে একটি হস্তী-চিহ্নিত ও কারুকার্য খচিত প্রস্তরফলক পরিদর্শন করেন। তাঁহার মতে প্রস্তর ফলকাদি কোন এক সময়ে ত্রিবেণী হইতে তথায় স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীযুক্ত পাল সপ্তগ্রাম কলোনী পরিদর্শন কালে 'মনসাতলা' নামক স্থানে কতিপয় প্রস্তর ফলক, দুইটি প্রাচীন ইষ্টক এবং একটি মৃন্ময় স্ত্রী-মূর্তির মস্তকদেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দ্বারবাসিনীতেও এই প্রকার মৃন্ময় স্ত্রী মূর্তির মস্তকদেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, দ্বারবাসিনী পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত।

পাণ্ডুয়া থানার কান্নুর নামক পল্লীতে কনকশিব নামক এক পুষ্করিণীর তীর খনন কালে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দিরের নিদর্শন এবং তথায় তিনটি অভগ্ন ও একটি ভগ্ন বিষ্ণু মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ঐগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত পাল এইরূপ অভিমত করেন যে, মন্দিরটি প্রায় ৭ শত বৎসরের প্রাচীন, সর্বপ্রথম মন্দিরটিতে কনকশিব নামক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে পাণ্ডুয়া যুদ্ধের সময়ে পাণ্ডুয়াবিহার হইতে বিষ্ণুমূর্তিগুলি কান্নুর স্থানান্তরিত হইয়া উক্ত মন্দিরে রক্ষিত হয়। মূর্তিগুলির আকার-প্রকার একই রকম, ইহাতে বেশ প্রমাণিত হয় যে, পাণ্ডুয়ায় মূর্তি-শিল্পের কারখানায় একই শিল্পীর দ্বারা মূর্তিগুলি নির্মিত হইয়াছিল।

মহানাদ রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সুদর্শন নামক পল্লীতে শ্রীযুক্ত পাল একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ এবং পাল যুগের বিবিধ দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তির ও প্রস্তর ফলক আবিষ্কার করিয়াছেন। মূর্তিগুলির মধ্যে নাগছত্রবিশিষ্ট দুইটি নারীমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় মূর্তি বৌদ্ধবিহার নালন্দায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত পাল সুদর্শনে আবিষ্কৃত পাঁচপ্রকার মৃন্ময় দ্রব্য, রঙিন মৃৎ-পাত্রখণ্ড এবং স্থানীয় জনাব জয়নাল আব্দিস সাহেবের নিকট হইতে

সংগৃহীত মোগল আমলের রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা আশুতোষ মিউজিয়ামে প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত মিউজিয়ামের পক্ষ হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয় সুদর্শন হইতে আটপ্রকার ভগ্ন প্রস্তর-মূর্তি লইয়া গিয়াছেন। সুদর্শনের ধ্বংস স্তূপটি খনন করিলে বহু প্রত্ন-দ্রব্য আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত পাল দণ্ডভুক্তির ইতিহাস সম্পর্কে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত দাঁতন নামক স্থান সুপ্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের অন্যতম রাজধানী দন্তপুর নামে আখ্যাত ছিল। পাল বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে বর্তমান সদর মহকুমার অন্তর্গত দাঁতন, কেশিয়াড়ী ও মোহনপুরা থানা এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত নয়াগ্রাম থানা লইয়া দণ্ডভুক্তি নামক এক নূতন জনপদ গঠিত হইয়াছিল।

দাঁতনে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি প্রস্তরময় বৃহদাকার বৃষমূর্তি, মৃগয়ার চিত্রখোদিত একটি প্রস্তর ফলক এবং একটি প্রস্তরময় মকরমূর্তি বিশিষ্ট পয়ঃপ্রণালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য, দাঁতনের পার্শ্ববর্তী উত্তররায় গ্রামে প্রস্তরময় দিগম্বর জৈনমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দাঁতন হইতে চার মাইল উত্তরে অমরাবতী নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অমরাবতীতে একটি প্রাচীন স্তূপ বিদ্যমান। ঐ স্থান খনন করিলে বহু প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাঁতনের চার মাইল দক্ষিণে কাকড়াজিৎ বা কর্ণজিত নামক স্থানে ভেটিয়া নামক পুষ্করিণীতে একটি প্রস্তরময় সিংহমূর্তি একটি বিষ্ণুমূর্তি ও দুইটি প্রস্তর স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। এই কাকড়াজিৎ নামক স্থানেই দণ্ডভুক্তিরাজ জয়সিংহ উৎকলাধিপতি কেশরী বংশের কর্ণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দাঁতনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সালিকোটা গ্রামে একটি বিষ্ণুমূর্তি, কড়াই গ্রামে একটি ব্রহ্মার মূর্তি, উড়শাল গ্রামে দুইটি ভগ্নমূর্তি এবং উড়শাল ও পঞ্চদুর্গাহাট গ্রামের মধ্যস্থলে একটি মনসা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

কেশিয়াড়ী থানায় রায়বেলিয়া গ্রামে একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দৃষ্ট হয়।

এই স্তূপটি খনন করিলে বহু প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, গ্রামস্থ একটি পুষ্করিণী খননকালে একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন দাঁতন থানার উত্তররায় গ্রামে এবং নয়াগ্রাম থানায় দোলগ্রামে আবিষ্কৃত দুইটি প্রতিমূর্তি যথাক্রমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দণ্ডভুক্তিরাজ ধর্মপাল এবং যুদ্ধরত দণ্ডভুক্তিরাজ জয়সিংহের প্রতিমূর্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

শ্রীপালের নির্দেশমত দাঁতন সাধারণ পাঠাগারে একটি প্রত্নশালা স্থাপিত হইয়াছে। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীপ্রবীরচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রচেষ্টায় 'দন্তপুর অনুসন্ধান সমিতি' গঠিত হইয়াছে এবং প্রত্নদ্রব্যাদির সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীপাল দণ্ডভুক্তির প্রাচীন কীর্তিগুলির পরিদর্শন এবং প্রাচীন ধ্বংস স্তূপগুলির খনন কার্যাদির জন্য ভারতীয় সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

অক্টোবর, ১৯৫২

মরুভূমিতে বরফের গুহা

আমেরিকার 'সাউথ ওয়েস্ট' মরুভূমির খুব উত্তপ্ত কোন কোন জলশূন্য অংশে কতকগুলি বিরাট আকারের বরফের গুহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ গুহাগুলির গভীরতা এবং উহারা কতকাল আগে সৃষ্ট হইয়াছিল, সে কথা জানা যায় নাই।

ইহাদের মধ্যে কালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মডক ও উত্তর অ্যারিজোনার সানসেট আগ্নেয়গিরির লাভাস্তরের অন্তর্নিহিত বরফের গুহাগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশের বেণ্ডেরা আগ্নেয়গিরির পাদদেশে অবস্থিত গুহাসমূহও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বহুকাল পূর্বে নিঃসৃত লাভাস্তরের নীচে এই সমস্ত বরফের গুহা সৃষ্ট হইয়াছে। ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন যে, বহু প্রাচীনকালে যখন ঘন ঘন

প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হইত, সেইরূপ কোন সময়ে গলিত লাভার স্রোতে ঐ সব অঞ্চল আচ্ছাদিত হইয়াছিল। ক্রমে হাওয়ার সংস্পর্শে লাভাস্তরের উপরিভাগ শীতল হইলেও ভিতরের অংশ কিছুকাল উত্তপ্ত থাকে। পরে ভিতরের গলিত লাভা অপসৃত হওয়ার ফলে উপরের শক্ত আবরণের নীচে স্থানে স্থানে ছোট বড় নানা আকারের এইসব গুহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঠিক কীভাবে ভূনিম্নে এইসব গুহার কতক-গুলি চির তুষারের আধারে পরিণত হইল তাহা অদ্যাবধি অজ্ঞাত রহিয়াছে।

বেণ্ডেরা আগ্নেয়গিরির ক্যাণ্ডালেরিয়া অঞ্চলের সর্ববৃহৎ গুহার বরফপুঞ্জ সমুদ্রের মত নীল রঙের এবং উহার মধ্যে আড়াআড়িভাবে কালো কালো রেখা দেখা যায়। গুহাটি উপরের কঠিন লাভাস্তরের মাত্র ২০ ফুট নীচে অবস্থিত এবং গুহামুখ অনাবৃত থাকা সত্ত্বেও গ্রীষ্মের প্রখর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কখনও ঐ গুহার বরফ গলিতে দেখা যায় নাই। গুহার মেঝের কঠিন বরফের স্তর কতদূর পর্যন্ত নীচে চলিয়া গিয়াছে, জানা যায় নাই। গুহার পশ্চাদ্বর্তী বরফের দেওয়াল ৫০´ ফুট প্রশস্ত এবং ৮ হইতে ১৪´ ফুট উচ্চ। ভূনিম্নে কতদূর পর্যন্ত এই বরফের নদী প্রবাহিত তাহা জানা যায় নাই।

নীল রঙের বরফের দেওয়ালগুলি কতযুগ ধরিয়া অটুট অবস্থায় বর্তমান আছে, কেহ বলিতে পারে না। ঐ অঞ্চলে শ্বেতকায় অধি-বাসীরা আসিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিল। অন্য কোনরূপ জলের ব্যবস্থা না থাকায় জলসরবরাহের জন্য ও ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্য তাহাদিগকে ওখান হইতে বরফের চাঁই কাটিয়া নিতে হইত; ইহার বহু নিদর্শন বর্তমান আছে। বরফের মধ্যে খনিত স্থান যেরূপভাবে ক্রমাগত ভরাট হইয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে, ঐ সব অঞ্চল যখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন্য লোকের আবাসস্থল ছিল তখনও যে জলের প্রয়োজনে তুষার গুহাটি ব্যবহৃত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিকটেই কতকগুলি গুহাতে সেই যুগের বসতির নিদর্শন

বর্তমান রহিয়াছে। সেই সব গুহা হইতে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা রেড ইণ্ডিয়ান-দের যন্ত্রপাতির মত কতকগুলি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়াছেন। নিউ মেক্সিকোর নৃতত্ত্বের ল্যাবরেটরির ডাঃ এইচ. পি. মেরার মতে, ঐ সব যন্ত্রপাতি ১১০০ খৃঃ অব্দে নির্মিত। তার হাজার বৎসর পূর্বেও হয়ত এই গুহাটি আদিম মানুষ তার জলের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছে। আদিম মানব বসতির পূর্বে আরও যে কত শত বৎসর ধরিয়া ঐ গুহাটি মরুপ্রাণীকে জল সরবরাহ করিয়াছে তাহা কে বলিবে।

অক্টোবর, ১৯৫২

তুষার মানবের পদচিহ্ন

১৯৫৪ সালে কারাকোরাম পর্বতশৃঙ্গ আরোহণে যে জার্মান অভিযাত্রী দল ব্যর্থতা বরণ করিয়াছেন, তাহারই সদস্য মি. কে. রেনার বলিয়াছেন, কারাকোরামের ১৪ হাজার ফুট উপরে আমি তুষার মানবের পদচিহ্ন দেখিয়াছি। এই তুষার মানব হিমানী সম্প্রপাত ও ৫০ মাইল বেগে প্রবাহিত তুষার ঝড় উপেক্ষা করিয়া ভয়ঙ্কর বল্‌তারো হিমবাহ পার হইয়া গিয়াছে। হিমবাহের চড়াই-উৎরাই ধরিয়া তাহার পদচিহ্নের সন্ধান মিলিয়াছে। ঠিক মানুষেরই মত চড়াইয়ে পায়ের ধাপগুলি ছোট, আর উৎরাইয়ে বড়।

এই পদচিহ্নগুলি অভিযাত্রী দলের অন্য কোন সদস্যের হইতে পারে না, কারণ পর্বতশৃঙ্গে শেষ অভিযান চালাইবার জন্য আমি ও আর একজন মাত্র নির্বাচিত হইয়াছিলাম।

অভিযাত্রী দলের সহকারী নেতা হের বিটারলিং বলেন, বিলম্বের জন্যই আমাদিগকে ব্যর্থতা বরণ করিতে হইয়াছে।

অভিযাত্রী দলের আর একজন সদস্য উইলহেল্‌ম্ কিক বলেন,

বালতিস্থান অঞ্চলে এখনও প্রস্তরযুগের সভ্যতা বিদ্যমান। এখানকার লোকেরা প্রস্তরের যন্ত্রপাতি দিয়া প্রস্তরের ঘরবাড়ি নির্মাণ করিয়া থাকে। নারীদের গড়ন বেশ সুদৃঢ়, তাহারা দেখিতেও সুন্দর, তাহারা পাথরের গহনা পরিয়া থাকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, পাথরের সেতু নির্মাণ করিতে তাহারা জানে না। বড় বড় ঘাস পাকাইয়া দড়ি তৈয়ারী করিয়া ছোটখাট নদী পারাপারের জন্য তাহারা সেতু নির্মাণ করে।

মার্চ, ১৯৫৫

তুষার মানবের পদচিহ্ন

'ব্রিটিশ পর্বতারোহী দল হিমালয় পর্বতের উর্ধ্বস্তরে কোন জন্তুর অতিকায় পদচিহ্নগুলিকে রহস্যময় তুষার মানবের বলিয়া অনুমান করেন।

ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর পর্বতারোহী সমিতি পরিচালিত অভিযাত্রী বাহিনীর নিকট হইতে বিমান মন্ত্রণালয় এই পদচিহ্নের সংবাদ পাইয়াছেন, উক্ত বৃটিশ অভিযাত্রী দল বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের কুলটি উপত্যকায় অভিযান চালাইতেছেন।

স্কোয়াড্রন লীডার এল. ডবলিউ. ডেভিস ও দলের অপর দুইজন সদস্য সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২,৩৭৫ ফুট উর্ধ্বে তুষারাবৃত কুলটি উপত্যকায় ১২ই জুন প্রত্যুষে পদচিহ্নগুলি দেখিতে পান। তাঁহাদের শেরপারা বলেন যে, পদচিহ্নগুলি বনমানুষাকৃতি তুষার মানবের।

স্কোয়াড্রন লীডার ডেভিস বলেন যে, পদচিহ্ন অনেকগুলি ছিল। প্রত্যেকটি চিহ্নের পরিমাপ ১২ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি। চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় যে, ঐগুলি কোন দ্বিপদ প্রাণীর পদচিহ্ন এবং প্রত্যেক পায়ে সিকি ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক পাঁচটি করিয়া আঙুল আছে। চিহ্নগুলি তুষারের মধ্যে

আট ইঞ্চি গভীর হইয়া বসিয়াছিল। অপরপক্ষে অভিযাত্রী দলের সদস্যদের পায়ের চিহ্ন এক ইঞ্চি গভীর হয়।
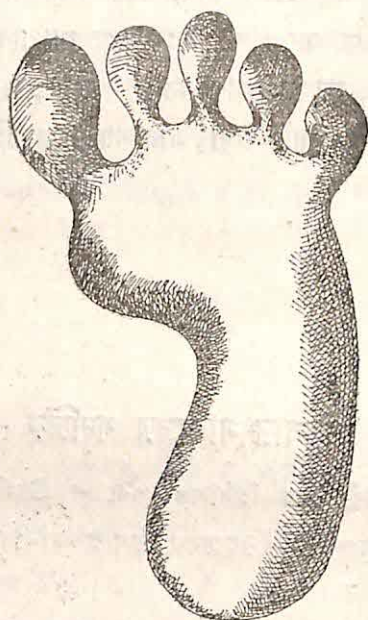
স্কোয়াড্রন লীডার ডেভিস আরও বলেন যে, পদচিহ্নগুলি ভল্লুকের পদচিহ্ন অপেক্ষা বড়। ১১ই জুন বিকাল বেলা তিনি যখন ঐ অঞ্চল অতিক্রম করিয়াছিলেন তখন তিনি পদচিহ্ন দেখিতে পান নাই। কাজেই প্রাণীগুলি সম্ভবত রাত্রিবেলা উপত্যকা দিয়া গিয়াছিল।

প্রাণীটি উপত্যকার পশ্চিম দিক হইতে নামিয়া আসে এবং অন্তত তিনটি খরস্রোতা নদী পার হইয়া উপত্যকার পূর্ব দিকে পাহাড়ে আরোহণ করে, ইহার পর পদচিহ্ন আর দেখা যায় নাই।'

জুলাই, ১৯৫৫

তুষার মানবের অস্তিত্বে সন্দেহ

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযাত্রী দলের সদস্য ডাঃ স্ট্যাফোর্ড ম্যাথুজ কলিকাতা রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, হিমালয়বাসী তুষার মানব ইয়েতির কোন অস্তিত্ব নাই। ইয়েতি সকলের সুপরিচিত একটি জন্তু। তিনি বলেন, সকলেই যখন জানেন ভল্লুকের পায়ে পাঁচটি আঙুল তখন ইয়েতির বিষয়ে মত দেওয়া অর্থহীন।

নিউজিল্যাণ্ডবাসী পর্বতারোহী ডাঃ ম্যাথুজ বলেন যে, সূর্যালোকে তুষার গলিয়া পায়ের ছাপগুলি বড় হইয়া ফুটিয়া উঠে। তিনি নিজে উচ্চ পর্বতে কতকগুলি ছোট ছোট জন্তুর আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। উহারা তুষার ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার পর গলিয়া যাওয়া তুষারের ওপর তাহাদের পায়ের ছাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় দেখা যায়।

১৯৫৩ সালে অভিযাত্রীরা ইয়েতির মুণ্ড বলিয়া অভিহিত যে মুণ্ডটি ইংল্যাণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন সেটি প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন একপ্রকার-জন্তুর, ইয়েতির নহে।

রোটারি ক্লাবের সভায় ডাঃ ম্যাথুজের বক্তব্য বিষয় ছিল—হিমালয়ের উচ্চস্তরে আরোহণ। তিনি বলেন যে, হিমালয়ের বড় বড় পর্বতারোহণ অভিযানের দিন বলিতে গেলে শেষ হইয়াছে। অবশ্য এখনও হিমালয়ের এমন দুই একটি শিখর আছে যেগুলি উচ্চতায় ছোট হইলেও ইতিমধ্যে চিহ্নিত শিখরগুলি অপেক্ষা দুরূহ।

ডাঃ ম্যাথুজ একজন চিকিৎসক, তিনি বলেন যে, যাঁহারা পর্বতারোহণ করিবেন তাঁহাদিগকে ছয় রকমে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রথমত সঙ্গীদের সহিত মানাইয়া চলার জন্য প্রস্তুত হওয়া, দ্বিতীয়ত, দিনে আট দশ ঘণ্টা পর্বতারোহণের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য মনকে অধিকার করিয়া রাখিতে জানা। তৃতীয়ত, কি হইবে সে সম্পর্কে ভয় কাটাইতে জানা। চতুর্থত, ঠাণ্ডা সহ্য করিতে জানা। পঞ্চমত, অতিরিক্ত পরিশ্রম সহ্য করিবার

জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং ষষ্ঠত, উচ্চ পর্বতভূমির শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় মানাইয়া চলিতে অভ্যাস করা।

জুলাই, ১৯৫৫

অজ্ঞাত আকৃতির তুষার মানব

কাঠমাণ্ডুর খবরে প্রকাশ কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে বিজয়ী অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য ক্যাপ্টেন স্ট্রীথার বলেন যে, হিমালয়ে তুষার মানব দেখিতে যে কিরূপ, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইনি মিঃ এন. ডি. যার্ভির সহিত সম্প্রতি কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত অভিযান করিয়াছিলেন। এই অভিযাত্রী দলের নেতা ডাঃ ইভান্স যে কলিকাতায় সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতিতে তুষার মানবের অস্তিত্ব নাই বলিয়াছেন, তিনি তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, তিনি এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ডাঃ ইভান্স যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই যে, তুষার মানবের আকৃতি কিরূপ তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

জুলাই, ১৯৫৫

তুষার মানবের পদচিহ্ন

কাটমাণ্ডু-মাকালু শৃঙ্গে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য যে অভিযাত্রীদল গমন করেন তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ফরাসী ভূতত্ত্ববিদ মঁ লাত্রোফল্ এবং মঁ পিয়েরবার্দকে লইয়া ঐ দল গঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, তুষার মানবের কাহিনী বাস্তব সত্য,

ঐ দুইজন ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মাকালু শৃঙ্গের পাদদেশে পর্যবেক্ষণের কার্য সমাপ্ত করিয়াছেন। বরুণ উপত্যকায় তাঁহারা এক তুষার মানবের পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদের মনে হয় যে, একদিন পূর্বে তুষার মানবটি ঐ পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা এক মাইল ধরিয়া ঐ পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া গমন করেন এবং পরে কঠিন পাথরের উপর ঐ পদচিহ্ন আর খুঁজিয়া পান না। তাঁহারা মনে করেন যে, ঐ জীবটি মানুষের ন্যায় দুই পায়ে হাঁটিয়া থাকে। তাঁহারা তুষার মানবের পদচিহ্নের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। মাকালু শৃঙ্গে যে অভিযাত্রীদল আরোহণ করেন, ঐ দুই জন ভূতত্ত্ববিদ সেই দলভুক্ত। তাঁহারাও মাকালু শৃঙ্গে (২৭, ৭৯০) ফুট আরোহণ করেন।

মে, ১৯৫৫

কুমেরু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অভিযান

গত ৪ঠা অক্টোবর [১৯৫৪] ফক্ল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডস্ ডিপেনডেনসিজ সার্ভের উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবার জন্য একদল লোক সাদাম্পটন হইতে রাজকীয় গবেষণা পোত জন বিস্কো'তে করিয়া কুমেরু অভিমুখে যাত্রা শুরু করিয়াছেন। ডাঃ ফুক্স উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্মের পরিচয় দিয়াছেন এবং উক্ত গবেষণাকারীরা যে অবস্থার মধ্যে আগামী দুই বৎসর কাজ করিবেন তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন।

দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু যে ভূখণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তাহার আয়তন ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত আয়তনের সমান। এই বিরাট ভূখণ্ডের তিন-পঞ্চমাংশ কমনওয়েলথের জাতিসমূহের অধিকারভুক্ত।

১৭৭২-৭৫ সালে সার জেমস কুক সর্বপ্রথম কুমেরু বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করেন। উহার পর বৃটেন এই অঞ্চলে যতবার অভিযান চালাইয়াছেন,

অন্য কোন দেশ মিলিতভাবেও ততবার অভিযান চালায় নাই। বৃটিশ অভিযানের ইতিহাসে স্কট ও শ্যাকলটনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। ১৯০৮ সালে বৃটেন কুমেরুর উত্তর পার্শ্বে, দক্ষিণ আমেরিকার দিকে বিস্তৃত ভূভাগের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এই অঞ্চলের নাম ফক্ল্যাণ্ড ডিপেনডেনসিজ। ইহার মধ্যে গ্রাহামল্যাণ্ড উপদ্বীপ এবং অন্যান্য বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ আছে। বর্তমানে ফক্ল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডস্ ডিপেনডেনসিজ সার্ভে নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে যাহার কাজ হইল—যে সকল অঞ্চল জরীপ করা হয় নাই সেগুলির মানচিত্র প্রস্তুত করা, আবহাওয়া কেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে গবেষণা ইত্যাদি করা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যে সকল অভিযান পরিচালিত হয়, সেগুলির অপর একটি উদ্দেশ্য হইল ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের উপর বৃটেনের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা; কারণ সম্প্রতি আর্জেন্টিনা এবং চিলি এই দ্বীপপুঞ্জের উপর তাহাদের দাবী উত্থাপন করিয়াছে।

গত ৪ঠা অক্টোবর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবার জন্য এক দল 'জন বিসকো' নামক গবেষণা পোতে করিয়া কুমেরু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হইয়া দুই বৎসর নির্জনবাস করিবেন এবং এক বৎসর পরে একবার জাহাজটির দেখা পাইবেন। একমাত্র বেতারের মারফতেই তাঁহারা বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন। তাঁহাদের জীবন খুবই নিঃসঙ্গ ও কঠিন হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করা হইয়াছে তাঁহাদের এমন সব শারীরিক ও মানসিক গুণ আছে যাহার ফলে তাঁহারা বহু প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কাজ করিতে, এমন কি তথাকার জীবন উপভোগ করিতেও সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কুমেরু প্রদেশ পর্বতসঙ্কুল ও তুষারাবৃত। উপত্যকাগুলির মধ্য দিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হিমস্রোত সমুদ্রের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

'জন বিসকো' জাহাজ

অন্য কোন দেশ মিলিতভাবেও ততবার অভিযান চালায় নাই। বৃটিশ অভিযানের ইতিহাসে স্কট ও শ্যাকলটনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। ১৯০৮ সালে বৃটেন কুমেরুর উত্তর পার্শ্বে, দক্ষিণ আমেরিকার দিকে বিস্তৃত ভূভাগের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এই অঞ্চলের নাম ফক্‌ল্যাণ্ড ডিপেনডেনসিজ। ইহার মধ্যে গ্রাহামল্যাণ্ড উপদ্বীপ এবং অন্যান্য বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ আছে। বর্তমানে ফক্‌ল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডস্ ডিপেনডেনসিজ সার্ভে নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে যাহার কাজ হইল—যে সকল অঞ্চল জরীপ করা হয় নাই সেগুলির মানচিত্র প্রস্তুত করা, আবহাওয়া কেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে গবেষণা ইত্যাদি করা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যে সকল অভিযান পরিচালিত হয়, সেগুলির অপর একটি উদ্দেশ্য হইল ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের উপর বৃটেনের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা ; কারণ সম্প্রতি আর্জেন্টিনা এবং চিলি এই দ্বীপপুঞ্জের উপর তাহাদের দাবী উত্থাপন করিয়াছে।

গত ৪ঠা অক্টোবর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবার জন্য এক দল 'জন বিসকো' নামক গবেষণা পোতে করিয়া কুমেরু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হইয়া দুই বৎসর নির্জনবাস করিবেন এবং এক বৎসর পরে একবার জাহাজটির দেখা পাইবেন। একমাত্র বেতারের মারফতেই তাঁহারা বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন। তাঁহাদের জীবন খুবই নিঃসঙ্গ ও কঠিন হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করা হইয়াছে তাঁহাদের এমন সব শারীরিক ও মানসিক গুণ আছে যাহার ফলে তাঁহারা বহু প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কাজ করিতে, এমন কি তথাকার জীবন উপভোগ করিতেও সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কুমেরু প্রদেশ পর্বতসঙ্কুল ও তুষারাবৃত। উপত্যকাগুলির মধ্য দিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হিমস্রোত সমুদ্রের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

'জন বিসকো' জাহাজ

সমুদ্র বৎসরের মধ্যে সাধারণত ছয় অথবা নয় মাস জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। কুকুর ও শ্লেজ লইয়া অভিযাত্রীরা ভূমি ও সমুদ্রপৃষ্ঠে বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ খুবই বিপদসঙ্কুল। ভূমিপৃষ্ঠে তুষারে আবৃত এমন সব বৃহৎ গর্ত থাকে সেগুলির মধ্যে পড়িলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কুকুর-টানা শ্লেজ ছাড়া এখানে আর কোনো যান ব্যবহার করা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে কোনো অপেক্ষাকৃত সুন্দর দিনে কুকুরের সহিত মানুষের রেস হয়। কুকুরগুলি শ্লেজ টানিয়া দৌড়ায় এবং কোনো লোক স্কি করিয়া তাহাদের সহিত পাল্লা দেয়। ইহাতে যে উত্তেজনা ও আনন্দ লাভ ঘটে তাহা বুঝিতে হইলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

অনেকে প্রশ্ন করেন, কুমেরু অঞ্চলে গিয়া কার্জ করিবার প্রয়োজন কি? ইহার অনেকগুলি উত্তর আছে। প্রথমত, কুমেরু অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ তিমির তৈল সংগৃহীত হয় তাহার মূল্য প্রায় ৩,০০,০০,০০০ পাউণ্ড [তৎকালে]। এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদও প্রচুর; এ পর্যন্ত যদিও তাহা আহরণের ব্যবস্থা করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, কুমেরু ভূভাগের বিরাট তুষার মণ্ডল দক্ষিণ গোলার্ধের এবং কিয়ৎ পরিমাণে সমগ্র বিশ্বের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এখানকার আবহাওয়া-কেন্দ্রগুলির পূর্বাভাস জাহাজ চালক ও দক্ষিণ অঞ্চলের চাষীদের খুবই কাজে লাগে। বহু বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করিবার ফলেই বিশ্বের আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস করা সম্ভব হয়। যাঁহারা ভূতত্ত্ব ও ভূ-পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাঁহাদেরও এখানকার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ ও বাস্তব প্রয়োজন, এই দুই কারণেই কুমেরু অঞ্চলে অভিযান চালাইবার প্রয়োজন হয়।

এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যতের বিমান পথগুলির কথা চিন্তা করা যাক। আমেরিকা হইতে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া যাইতে হইলে কুমেরু ভূভাগের উপর দিয়া যাওয়াই সোজা। এই পথে ভ্রমণ করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদও বটে। এই পথে ভ্রমণ করিতে হইলে মানচিত্র, আবহাওয়ার পূর্বাভাস,

বেতার সংযোগের সমস্যা, চৌম্বক আকর্ষণের প্রতিক্রিয়া ও অন্যান্য বহু বিষয় সম্পর্কে সংবাদাদির প্রয়োজন হইবে।

যে সকল দেশ ও যে সকল ব্যক্তি দক্ষিণ মেরুর নির্জন তুষারাবৃত অঞ্চলে অভিযান চালাইতে ও বসবাস করিতে পারেন তাঁহারাই এই সকল প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ। ফক্‌ল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডস্ ডিপেনডেনসিজ সার্ভে নামক প্রতিষ্ঠানটি এই কাজই করিতেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের লোকেরাই গত মাসে [সেপ্টেম্বর] 'জন বিস্‌কো' জাহাজ যোগে কুমেরু অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫

দক্ষিণ মেরু অভিযান

নিউইয়র্ক—দক্ষিণ মেরু আবিষ্কৃত হয় ১৩৫ বৎসর পূর্বে। কিন্তু এই আবিষ্কারের পর হইতে এই পর্যন্ত দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে বিশেষ কোনও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি 'অ্যাটকা' নামে একখানা মার্কিন বরফ-ভাঙা জাহাজ পৃথিবীর এই অজ্ঞাত দেশ ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছে এবং শোনা যাইতেছে যে, ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, চিলি, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও নরওয়ের ২০টি ঘাঁটি তথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দক্ষিণ মেরুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু শতাব্দী যাবৎ লোকের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। ১৭৭২ সালে বৃটিশ নৌবহর, ক্যাপ্টেন জেমস কুককে এই অঞ্চল আবিষ্কারে পাঠায়। তিন বৎসর চেষ্টার পর কুক ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৮শ শতাব্দীতে ফরাসী আবিষ্কারকেরা বলেন যে, দূর হইতে তাঁহারা এই দেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮২০ সালে ন্যাথানিয়েল ব্রাউন পামার নামক একজন আমেরিকান এই অজ্ঞাত দেশে পদার্পণে সমর্থ হন।

১৯১১ সালে ডগলাস মসনের নেতৃত্বে একদল অস্ট্রেলিয়ান দক্ষিণ মেরুতে যান। ঐ দলের মসন ব্যতীত আর কেহই দেশে ফিরিয়া আসেন নাই।
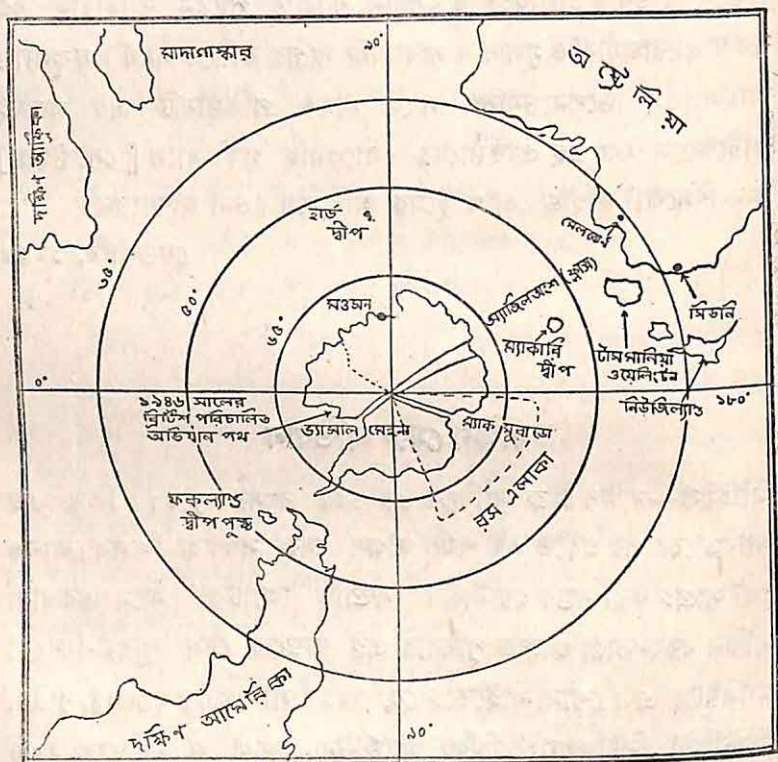
দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলের মানচিত্র

১৯৪৬-৪৭ সালে অ্যাডমিরাল রিচার্ড ই. বার্ডের নেতৃত্বে একদল আমেরিকান এই দেশ পর্যবেক্ষণে যান। এই দলেরই অন্যতম সদস্য কীর্নস এই বিস্তৃত অজ্ঞাত মহাদেশ সম্পর্কে এক বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত একদল বৃটিশ আবিষ্কারকও এই মহাদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

মে, ১৯৫৫

চাঁদের পাহাড় আবিষ্কার

লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডবলিউ. কিউ. কেনেডির নেতৃত্বে এক দল বিজ্ঞানী রুয়েনজোরি পর্বতমালা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বৃটেন হইতে পশ্চিম উগাণ্ডার পথে যাত্রা করিয়াছেন। এই পর্বতমালাই 'চাঁদের পাহার' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত।

অভিযাত্রী দল পূর্ব আফ্রিকায় তিন মাস কাটাইবেন। এই সময় তাঁহারা পর্বতমালায় ভূতত্ত্ববিষয়ক মানচিত্র প্রস্তুত করিবেন। এই পর্বতমালার তুষারাবৃত সর্বোচ্চ শিখরগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৭০০০ ফুট উচ্চে। ভূতত্ত্ববিষয়ক এই মানচিত্র 'গ্রেট রিফট ভ্যালীর' গঠন সম্পর্কিত সমস্যাবলী সমাধান কার্যে সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা হয়। পূর্ব আফ্রিকান মালভূমির উপর দিয়া এই উপত্যকা ৪০ মাইল প্রশস্ত এক গভীর খাদের আকারে অবস্থিত।

অধ্যাপক কেনেডি গত বৎসর ভূতত্ত্ববিষয়ক প্রাথমিক পর্যবেক্ষণকার্য চালান। তাঁহার সহিত অন্য যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের নাম হইল—ডঃ আর. বি. ম্যাক্‌কোনেল, উগাণ্ডার জিওলজিক্যাল সার্ভের কর্মচারী; ডঃ ভন [ফন] নোরিং লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনল্যাণ্ডবাসী ভূতত্ত্ববিদ্, মিঃ জি. পি. লীডাল এবং মিঃ জি. পি. এল. ওয়াকার, লীডস্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রিসার্চ ছাত্র এবং মিঃ জে. এম. কার, অক্সফোর্ডের রিসার্চ ছাত্র। এই দলটি উচ্চ কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পর্যবেক্ষণকার্য চালায়।

১৯৫২ সালের দলটিতে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে ভূতত্ত্ববিদ্, বৃটিশ মিউজিয়াম সংগ্রাহক হিমবাহবিদ্ এবং আবহতত্ত্ববিদ্ আছেন।

ভূসংস্থান বর্ণন

গত বৎসর এপ্রিল মাসে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বিমানযোগে ঐ অঞ্চলের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। নাইরোবির একটি ফার্ম এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই অঞ্চলের পর্বতমালা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে যে বিশেষ অসুবিধা আছে তাহা হইল এই যে, পর্বত শিখরগুলি প্রায় সকল সময় মেঘাবৃত থাকে। প্রত্যেক বৎসর কেবল মাত্র কয়েক-দিনের জন্য মেঘমুক্ত হয় এবং এই সময় তাঁহারা আন্‌সান্‌ বিমান হইতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।

বর্তমান দলটির যন্ত্রপাতি এবং বিশেষ উপকরণাদি ইতিমধ্যে উগাণ্ডায় প্রেরিত হইয়াছে। দলটি নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত হিমবাহগুলি পরিদর্শন করিবে এবং জীববিদ্যা সংক্রান্ত অন্যান্য কাজও পর্বতের বিভিন্ন স্থান হইতে চলিতে থাকিবে।

যে তিন মাসকাল তাঁহারা এই অনাবিষ্কৃত পর্বতমালায় কাটাইবেন সেই তিন মাসকাল দলের সভ্যেরা সকলেই সভ্যজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবেন। রেডিও যন্ত্র বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যাওয়া সেখানে সম্ভব হইবে না।

পর্বতের এই অংশে গাছপালা ১৪,০০০ ফুট উপরে শেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 'চাঁদের পাহাড়' নামটা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এক সময় লোকে মনে করিত নীল নদের উৎপত্তি স্থল হয়ত এই অঞ্চলে। দলটি ৫,০০০ ফুট উচ্চে একটি শিবির স্থাপন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। সেই স্থান হইতে তাঁহারা বাকানজো উপজাতীয় পোর্টারদের সাহায্যে পর্বত আরোহণ কার্য শুরু করিবেন।

এই অভিযান সম্পর্কে অর্থব্যয় করিবেন উগাণ্ডার গভর্নমেণ্ট, ঔপনিবেশিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণ তহবিল, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, রয়াল সোসাইটি, রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়।

জুলাই ১৯৫২

নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার

তাজিক প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান-মন্দিরের স্তালিনাবাদ মানমন্দিরের ডাই-রেক্টর এ. ভি. সোলভিয়ফ বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলে একটি নতুন তারা আবিষ্কার করিয়াছেন।

বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র খচিত আকাশকে নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণে প্রতিবৎসরেই একটি-দুটি নূতন তারার বিচ্ছুরণ প্রায়শ ঘটে থাকে, স্তালিনাবাদ মানমন্দির নিরন্তর সেই অংশের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ভাবে ১৯৪৫ সালে গরুড় নক্ষত্রপুঞ্জে একটি নূতন তারা আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং ১৯৫০ সালে আর একটি ধরা পড়ে বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলীতে। সর্বশেষে বর্তমান বৎসরের আগস্ট মাসে ১১ই তারিখে বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলীতে আর একটি নূতন নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইল।

এই তারাটি কদাচিৎ ঝিকৃমিক্ করে। সুযোগমত ইহার বিচ্ছুরণের আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছে। ফটো থেকে বোঝা যায়, তারাটির বিচ্ছুরণ হইয়াছিল ৯ই আগস্ট তারিখে।

যেখানে এই নূতন তারাটিকে পাওয়া গেল সেখানে গত পঞ্চাশ বৎসরে দশটি নূতন নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। [সূত্র: তাস]

নভেম্বর, ১৯৫২

সৌরজগতে চাঁদের সংখ্যা

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই তেমন কোনো সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই, কিন্তু চাঁদের সঙ্গে আমাদের সবারই পরিচয় ঘনিষ্ঠ। আকাশের বিভিন্ন স্থানে কখনও এক খণ্ড সরু ফালির মতো, কখনও অর্ধ-গোলকের মতো, কখনও বা সম্পূর্ণ গোল একখানা থালার মতো চাঁদকে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। কিন্তু চাঁদ বলতে কী বোঝায়?

চাঁদ বলতে বোঝায় যে কোনো উপগ্রহকে, অর্থাৎ আকাশের এমন কোনো বস্তুপিণ্ড যা কোনো গ্রহের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। চাঁদ আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, সেজন্য তাকে বলা হয় পৃথিবীর উপগ্রহ। কিন্তু সৌর পরিবারে পৃথিবী ছাড়া আরও অনেকগুলি গ্রহ আছে। পৃথিবীর চাঁদের মতো তাদের আর কারোর কি চাঁদ নেই? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে—পৃথিবীর চাঁদের মতো অন্যান্য অনেক গ্রহেরই চাঁদ আছে এবং এদের প্রত্যেকেরই [পৃথিবী এবং প্লুটো ছাড়া] চাঁদের সংখ্যা, একাধিক। এই চাঁদগুলি বিভিন্ন কক্ষ পথে এক একটি গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এদের মধ্যে এমন কয়েকটি চাঁদ আছে, যারা আমাদের পৃথিবীর চাঁদের চেয়েও বড়। কিন্তু বড় হলে কী হবে, সেগুলি আমাদের পৃথিবী থেকে এত দূরে রয়েছে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত বহুকাল তাদের সন্ধান পাননি, বর্তমান যুগেই মাত্র তাদের অনেকের অস্তিত্বের খবর জানা গেছে। খালি চোখে অবশ্য এদের কারোরই দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। ভালো একটা বাইনোকিউলারের সাহায্যে বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদ অনায়াসেই দেখা যেতে পারে। শনি গ্রহের সব চেয়ে বড় চাঁদটাকে ছোট টেলিস্কোপের সাহায্যেই দেখা যায়। পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিস্কোপের সাহায্যে বৃহস্পতি গ্রহের ছয়টি ক্ষুদ্রায়তন চাঁদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের কয়েকটির ব্যাস ২০ মাইলেরও কম। সময়ে এগুলিকে পূর্ণ বৃত্তাকার, আবার কখনও কখনও অর্ধ-বৃত্তাকারে দেখা যায়। সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে এরা আলোকিত হয়ে থাকে।

প্রায় ৩৪০ বছর পূর্বে গ্যালিলিও বৃহস্পতি গ্রহের দিকে তাঁর প্রথম টেলিস্কোপটির মুখ ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বৃহস্পতি গ্রহের চারটি উজ্জ্বল চাঁদ দেখতে পান। এর আগে কেউ ধারণাও করেনি যে, পৃথিবীর চাঁদের মতো অন্যান্য গ্রহেরও চাঁদ থাকতে পারে। এই চারটি চাঁদের মধ্যে একটি আমাদের পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে আকারে ছোট, অপর তিনটি আমাদের চাঁদের চেয়ে বড়।

বৃহস্পতির চারটি চাঁদ আবিষ্কার করে গ্যালিলিও যে গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন, বর্তমান যুগে বৃহস্পতির আরও চারটি চাঁদ আবিষ্কার করে মাউন্ট উইলসন ও প্যালোমার মানমন্দিরের ডাঃ নিকলসনও সেই গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। ১৯১৪ সালে ডাঃ নিকলসন বৃহস্পতির একটি ছোট চাঁদ এবং ১৯৩৮ সালে আরও দুটি ছোট চাঁদ আবিষ্কার করেন। তাছাড়া সম্প্রতি তিনি বৃহস্পতির আর একটি ছোট চাঁদ আবিষ্কার করেছেন। এই নিয়ে বৃহস্পতি গ্রহের মোট চাঁদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১২টি [দ্র. প্রাসঙ্গিক তথ্য]। বৃহস্পতির এই উপগ্রহ আবিষ্কার সম্বন্ধে গ্যালিলিও এবং নিকলসন উভয়েরই প্রথমে একই রকমের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। বৃহস্পতির চাঁদগুলিকে দেখে গ্যালিলিও প্রথমে ভেবেছিলেন—সেগুলি সম্ভবত কোনো নক্ষত্র হবে, কোনো কারণে হয়তো গ্রহটার কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে! কিন্তু কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি দেখতে পেলেন—সেই উজ্জ্বল পদার্থগুলি বৃহস্পতির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডাঃ নিকোলসনও সম্প্রতি আবিষ্কৃত বৃহস্পতির এই দ্বাদশতম চাঁদটাকে প্রথমে কোনো ছোট গ্রহ বলে ভেবেছিলেন। তার পরে ধারণা হলো—হয়তো কোনো পূর্ব পরিচিত উপগ্রহকেই তিনি নতুন চাঁদ বলে ভুল করছেন। কিন্তু বারংবার পর্যবেক্ষণ, ছোট উপগ্রহগুলির কক্ষ-পথের খুঁটিনাটি হিসাব এবং অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার ফলে এটা যে বৃহস্পতির একটা উপগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়, সে-কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। বৃহস্পতির চারদিক ঘুরে আসতে এই নতুন চাঁদটির প্রায় দু-বছরের মতো সময় লাগে। বৃহস্পতির বহির্দেশে প্রায় ১৪,০০০,০০০ মাইল দূরে বিভিন্ন কক্ষপথে যে চারটি চাঁদ ঘুরে বেড়ায়, নতুন আবিষ্কৃত চাঁদটি তাদের অন্যতম। এটা হলো বৃহস্পতির দূরতম উপগ্রহ।

গ্যালিলিও এবং নিকলসন ছাড়া আরও দু-জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী চারটি চাঁদের আবিষ্কারক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ১৮৮৫সালের পূর্বে প্যারিস মানমন্দিরের ডিরেক্টর জিওভ্যানি ডোমেনিকো ক্যাসিনী

শনি গ্রহের চারটি চাঁদ আবিষ্কার করেন। প্রখ্যাত বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্সেলও চারটি চাঁদের আবিষ্কর্তা। তিনি শনি গ্রহের দুটি এবং ইউরেনাসের দুটি চাঁদ আবিষ্কার করেছিলেন।

মোটের উপর সৌর-পরিবারের অধিকাংশ গ্রহেরই উপগ্রহ, অর্থাৎ চাঁদ আছে এবং সব সমেত ৩১টি চাঁদ তাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রহগুলিও তাদের নিয়ে আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীদের মতে সৌর-পরিবারের এই ৩১টি উপগ্রহ বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভূত হয়েছে। এ বিষয়ে ইয়ার্কিস মানমন্দিরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাঃ কুইপারের অভিমত এই যে, পৃথিবীর চাঁদ হয়তো পৃথিবীর সঙ্গে যমজ গ্রহরূপেই জন্মগ্রহণ করেছিল। আমাদের চাঁদের ব্যাস হলো ২১৫৯ মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশেরও বেশি। তাছাড়া অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে তাদের উপগ্রহের তুলনামূলক হিসাবে আমাদের চাঁদের বস্তু পরিমাণও বেশী। এছাড়া অন্যান্য উপগ্রহগুলি হয়তো তাদের নিজ নিজ গ্রহ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ১৯টি চাঁদ তাদের নিজেদের গ্রহের গতি অভিমুখেই প্রায় বৃত্তাকার পথে তাঁদের প্রদক্ষিণ করতে থাকে; কিন্তু অপর ১২টি চাঁদ প্রথম অবস্থাতেই বোধহয় গ্রহের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্ন গ্রহগুলি হয়তো তাদের জন্মদাতা গ্রহের প্রায় সমবর্ত্মেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তারপর দীর্ঘকাল পরেই হোক, কি আগেই হোক, আবার তারা জন্মদাতা গ্রহের আওতার মধ্যে এসে পড়ে। এর ফলেই বোধহয় তাদের কতকগুলি পূর্বেকার দিক পরিবর্তন করে বিপরীত দিকে ঘুরতে বাধ্য হয়। এ-কারণেই বৃহস্পতি, শনি এবং নেপচুনের কয়েকটি চাঁদকে একদিকে এবং অপরগুলিকে বিপরীত দিকে ঘুরতে দেখা যায়। বৃহস্পতির ৭টি চাঁদ বিপরীত দিকে ঘুরে বেড়ালেও তাদের মধ্যে বোধহয় মাত্র দুটি চাঁদ পুনর্বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সম্ভবত দুটি চাঁদ ভেঙে গিয়ে বৃহস্পতির ক্ষুদ্রায়তন চাঁদগুলি উৎপন্ন হয়েছে।

ডাঃ কুইপারের মতে বৃহস্পতি থেকে আরও উপগ্রহ জন্মলাভ করে

তার আওতা ছেড়ে চলে যায় এবং আর ফিরে আসে নি। সেগুলি এখনও হয়তো বহু দূরের কক্ষ-পথে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের আকারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। এ রকমের প্রায় ১২টি খুদে গ্রহ বৃহস্পতির মতো দূরত্বে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। হিডেলগো নামে এরূপ দূরতম খুদে গ্রহটি বৃহস্পতি ও শনির মধ্যবর্তী কক্ষ-পথে সূর্যের চারধারে ঘুরে বেড়ায়।
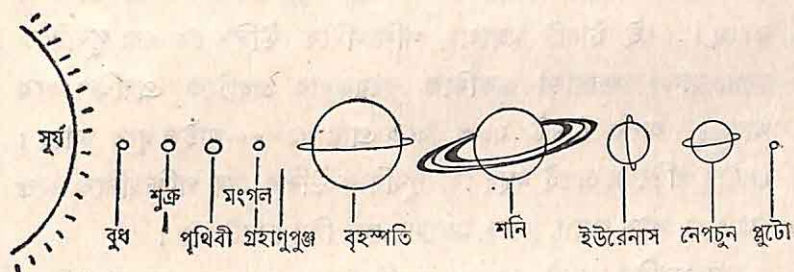
সূর্য ও তার নয়টি গ্রহ

আমাদের পৃথিবীর চারধারে একটি মাত্র চাঁদই ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এমন দিন হয়তো আসবে যখন আমরা পৃথিবীর দ্বিতীয় আর একটি চাঁদ দেখতে পাব। ছোট্ট একটি উপগ্রহের মত বস্তুপিণ্ডকে পৃথিবী থেকে ৬০০ মাইল বা আরও বেশী দূরে ছুঁড়ে দেবার ব্যবস্থার জন্যে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা উঠে পড়ে লেগেছেন। একবার ছুড়ে দিতে পারলে সেটা চাঁদের মতই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকবে। এই ছুঁড়ে দেওয়া বস্তুপিণ্ডটার মধ্যে এমন সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি বসানো থাকবে, যাদের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের বাইরের বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। যান্ত্রিক কৌশলে বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে এরূপ একটা বস্তুপিণ্ডকে একবার পৃথিবীর বাইরে ছুঁড়ে মারতে পারলে বিনা ইন্ধনেই সেটা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াবে।

যতদূর জানা গেছে তাতে সৌর-পরিবারের এই ৩১টি উপগ্রহের মধ্যে কোনো জীবন্ত পদার্থের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে

শনিগ্রহের টাইটান নামে একটি মাত্র চাঁদের বায়ুমণ্ডল আছে ; সে বায়ু-মণ্ডলেও মিথেন গ্যাস ছাড়া আর কিছু নেই।

পৃথিবীর চাঁদই সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী উপগ্রহ। কারণ, সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ ও শুক্রের কোনো উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়নি। পৃথিবীর নিকটবর্তী মঙ্গল গ্রহের দুটি মাত্র ছোট চাঁদ আছে। তাদের একটার ব্যাস ১০ মাইল, আর একটার ব্যাস প্রায় ৫ মাইল মাত্র। এদের মধ্যে নিকটতম চাঁদটি ৪০০০ মাইল দূর থেকে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করছে। এই চাঁদটি মঙ্গলের পশ্চিমদিকে উদিত হয় এবং পূর্বদিকে অস্ত যায়। তাছাড়া একদিকে কয়েকবার গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। অপর চাঁদটি মঙ্গল থেকে প্রায় ১৫০০০ মাইল দূরে আছে। সেটার গতিবেগ এতই মন্থর যে, পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিমদিকে অস্ত যেতে যে সময় লাগে, তাতে মঙ্গলের দুটি দিন কেটে যায়।

বৃহস্পতির ছোট বড় যে ১২টি চাঁদ দেখতে পাওয়া গেছে বিগত ৫০ বছরের মধ্যে এর ৭টির ফটোগ্রাফ তোলা সম্ভব হয়েছে। শনি-গ্রহের এপর্যন্ত ৯টি চাঁদের সন্ধান পাওয়া গেছে। অপেক্ষাকৃত নিকট-বর্তী ৫টি চাঁদ শনি-বলয়ের প্রায় সমতলে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষ-পথে গ্রহটিকে পরিভ্রমণ করে।

১৭৮১ সালে উইলিয়াম হার্সেল ইউরেনাস গ্রহটিকে আবিষ্কারের পর ১০ বছরের মধ্যেই তিনি তার দুটি চাঁদের সন্ধান পান। এর একটির ব্যাস প্রায় ১০০০ মাইল, অপরটির ব্যাস ৮০০ মাইল। এর প্রায় ৬৫ বছর পরে গ্রহটির অনেক নিকটে অপেক্ষাকৃত ছোট আরও দুটি চাঁদ আবিষ্কৃত হয়। প্রায় বছর তিনেক পূর্বে ডাঃ কুইপার পঞ্চম উপগ্রহটি আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী ইউরেনাসের সূর্য পরিভ্রমণ পথের খানিকটা অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হওয়ার ফলে ১৮৪৬ সালে নেপচুন আবিষ্কৃত হয়। গ্রহটি আবিষ্কারের পর মাসখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী লাসেল এর বৃহৎ উপগ্রহটিকে আবিষ্কার

করেন। এটা সম্ভবত আমাদের পৃথিবীর চাঁদের মতই বড়। ১৯৪৯ সালের মে মাসে ডাঃ কুইপার এর আর একটি চাঁদ আবিষ্কার করেছেন।

প্লুটো গ্রহটিই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় ২০ বছর আগে। আজ পর্যন্ত বহু অনুসন্ধানেও এর কোনো চাঁদ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

সৌরজগতে এই ৩১টি চাঁদ ছাড়া আর কোনো চাঁদের অস্তিত্ব নেই—এমন কথা জোর করে বলা যায় না। হয়তো এই বিশাল সৌর-পরিবারে আরও দু-একটি ছোটখাটো অস্পষ্ট চাঁদের সন্ধান পাওয়া বিচিত্র নয়।

সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

চন্দ্রলোকে ভ্রমণ

মস্কোর খবরে প্রকাশ, আগামী পাঁচ অথবা দশ বৎসরের মধ্যে চন্দ্রলোকে ভ্রমণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া রুশ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থার বেতার পরিচালনা সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির সভাপতি অধ্যাপক বুট্জেভিক চাকনেভ এরো ক্লাবে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, চন্দ্রলোকে হাউই পাঠান ইতিপূর্বেই সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে।

পৃথিবীর চতুর্দিকে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের সম্ভাব্যতা সমর্থন করিয়া এবং পৃথিবীর আনুমানিক আড়াইশত মাইল ঊর্ধ্বাকাশে ইতিপূর্বেই রকেট প্রেরণ করা হইয়াছে—এই তথ্য পরিবেশন করিয়া তিনি বলেন যে, প্রথমবার মানুষ ছাড়াই চন্দ্রলোকে ভ্রমণ করা বিধেয়। চন্দ্রলোকে মানুষ বহনের জন্য বহু লক্ষ টন ওজনের একটি রকেটের প্রয়োজন হইবে। পক্ষান্তরে কলের লাঙ্গল-সজ্জিত একটি বিদ্যুৎচালিত গবেষণাগার বহনের জন্য মাত্র কয়েকশত টন ওজনের একটি রকেটই যথেষ্ট।

ঐ গবেষণাগার চন্দ্রলোকের অবস্থা অনুধাবন করিয়া পৃথিবীতে বেতার ও টেলিভিশনযোগে তথ্য পাঠাইবে।

তিনি আরও বলেন যে, রেডারে ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রপাতির দ্বারা পৃথিবী হইতে বেতারযোগে রাস্তায় চলাচলকারী গাড়ি চালান যাইতে পারে বলিয়া দেখা গিয়াছে। পরবর্তী সময়ে মানুষ-বাহিত রকেট চন্দ্রলোকে অবতরণের সর্বাপেক্ষা উপযোগী স্থানে পাঠান হইবে। এই-ভাবে একবার চন্দ্রলোকে অভিযান সফল হইলে মঙ্গল, শুক্র অথবা অন্যান্য গ্রহেও যাওয়া যাইবে।

আগস্ট, ১৯৫৫

কৃত্রিম উপগ্রহ

কোপেনহেগেনের খবরে প্রকাশ, বিশিষ্ট রুশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিওলিড সেডভ বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মেলন মানবকল্যাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতার সহায়ক হইবে। তিনি বলেন যে, কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণ করা যাইবে বলিয়া এখন মনে করা হইতেছে। অল্প কিছুকাল আগেও ইহাকে পরিকল্পনা বলিয়া বিবেচনা করা হইত।

আগস্ট, ১৯৫৫

কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ—সোভিয়েট যুব সমাজের উদ্দেশ্যে প্রচারিত মস্কো বেতারের এক ভাষণে বলা হয় যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ইতি-

পূর্বেই পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

বেতারে আরও বলা হয় যে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে রাশিয়ার জি. সিল্‌কোভস্কী প্রথম পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের কথা চিন্তা করেন।

অগাস্ট, ১৯৫৫

মহাশূন্য পরিক্রমায় ব্যবহার্য পোশাক

ফানস্‌বরো (হ্যাম্পসায়ার)—মহাশূন্য পরিক্রমায় কী ধরনের পোশাক ব্যবহৃত হইবে, এখানকার বিমান প্রদর্শনীতে তাহা সর্বপ্রথম জনসাধারণকে দেখানো হয়। পোশাক পরিহিত নকল বৈমানিককে জনসাধারণের নিকট হাজির করিবার জন্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের কঠোরতা আংশিকভাবে হ্রাস করা হয়।

অগাস্ট, ১৯৫৫

মঙ্গলগ্রহে জীবন্ত পদার্থ

ওয়াশিংটন—মার্কিন ভৌগোলিক সমিতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, মঙ্গলগ্রহে এমন কিছু পরিদৃষ্ট হইয়াছে, যাহা জীবন্ত পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ১২৫ বৎসর পূর্বে সর্বপ্রথম মঙ্গলগ্রহের মানচিত্র অঙ্কিত হয়। আজ এতদিন পর সে মানচিত্রের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিতে চলিয়াছে।

জীবন্ত তৃণলতা বলিয়া যাহা মনে করা হইতেছে, ২ লক্ষ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া নীল-সবুজ বর্ণের এক বৃহৎ এলাকারূপে লাওয়েল গবেষণাগারে তাহার ফটো তোলা হইয়াছে।

এই বৃহৎ আবিষ্কারের কৃতিত্ব জাতীয় ভৌগোলিক সমিতির লাওয়েল

গবেষণাগারের অভিযাত্রীদলের নেতা ডাঃ ই. সি. শ্লিপারেরই প্রাপ্য। এই অভিযাত্রীদল গত বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মঙ্গলগ্রহের ফটো তোলে।

ডাঃ শ্লিপার একাই ২০ সহস্রাধিক ফটো তুলিয়া আনেন।

মঙ্গলগ্রহের বিস্তীর্ণ টোথ খালের নিকট যে নূতন অঞ্চল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। নূতন আবিষ্কারের ফলে আজ সন্দেহাতীতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হইয়াছে যে, মঙ্গল-গ্রহ নিষ্প্রাণ নহে।

সেখানে কী ধরনের তরুলতা থাকিতে পারে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য শীঘ্রই লাওয়েল গবেষণাগারে মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতশীর্ষে জাত শৈবালের চাষ করা হইবে।

আগস্ট, ১৯৫৫

প্রলয় পয়োধি জলে

ওমাহা (নেব্রাস্কা)—নিউইয়র্ক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর ফেলো ডাঃ ভিক্টর লেভিন এক বক্তৃতায় বলেন, মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করিবার একটি সহজ উপায় রহিয়াছে—তাহা হইল, মেরু অঞ্চলে গিয়া কয়েকটি আণ-বিক ও হাইড্রোজেন বোমা ফেলিয়া আসা।

আমাদের ও রুশদের হাতে যে সকল আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা রহিয়াছে, সেগুলির দ্বারা এই কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করা যাইবে। মেরু অঞ্চলের তুষার প্রান্তরে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপ করিতে পারিলে পৃথিবীর সমুদ্রজল স্ফীত হইয়া উঠিয়া নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেল্স্, প্যারিস ও টোকিও শহর প্লাবিত হইবে।

আগস্ট, ১৯৫৫

রঞ্জেন-রশ্মির কুফল

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, গর্ভাবস্থায় নারীদের দেহে রঞ্জেন-রশ্মি প্রয়োগ করা ঠিক নয় ; অবশ্য এর কুফল গর্ভাধানের প্রথম দেড় মাসের মধ্যেই ফলবে, পরে নয়। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রাণীদের নিয়ে এর পরীক্ষা করেছেন। গর্ভধারণের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ সপ্তাহের মধ্যে মাতাকে কোনো রকম রঞ্জেন-রশ্মির চিকিৎসা করা হলে গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর ওই রশ্মির প্রভাব দেখা দেয়। দেখা গেছে, এর ফলে সন্তানের দেহে বিভিন্ন বিকৃতি ঘটে। কাহারো চোখ হয় অস্বাভাবিক রকম ছোট, কাহারো হাত-পায়ের আঙুলের সংখ্যা কম, কাহারো বেশি। কোনো কোনা ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে এক বিশেষ ব্যাধি দেখা দেয়।

তবে গর্ভাবস্থায় প্রথম ছয় সপ্তাহের পরে রঞ্জেন-রশ্মির চিকিৎসায় কোনো রকম কুফল ফলতে দেখা যায় নি।

নভেম্বর, ১৯৫২

মৃতদেহের তাপ থেকে মৃত্যুকাল নির্ধারণ

পুলিশ হঠাৎ একটা অজানা মৃতদেহ পেয়েছে। কতক্ষণ আগে লোক-টির মৃত্যু হয়েছে জানতে পারলে এই মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন করা সহজ হয়। এর একটা মোটামুটি উপায় বের করা হয়েছে।

থার্মোমিটার দিয়ে মৃতদেহটির ভিতরকার কোনো এক জায়গার তাপ নিতে হবে। মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৮.৬° ফারেনহাইট ; এই ৯৮.৬° থেকে ওই তাপ পরিমাণ বাদ দিয়ে তাকে ১.৫ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। এভাবে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তত ঘণ্টা পূর্বে লোকটির মৃত্যু ঘটেছে। এ হিসেবটা অবশ্য সর্বক্ষেত্রে ঠিক হয় না। মৃত ব্যক্তি যদি মেদবহুল থাকে, তবে দেহটা তেমন তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় না। যদি

বেশ গরম পোশাক পরিচ্ছদ পরিহিত থাকে, তাহলেও তাপের হ্রাস-মাত্রার ব্যতিক্রম ঘটে। আবার স্বাস্থ্য, বয়স, এসবেরও একটা কথা আছে।

নভেম্বর, ১৯৫২

কলেরার জীবাণু কে আবিষ্কার করেছিলেন ?

এশিয়াটিক কলেরা আবির্ভাবের পর বহুকাল পর্যন্ত এর উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কোনো তথ্যই জানা যায় নি। ১৮৬৩ সালে এশিয়াটিক কলেরা ইউরোপে হানা দেয়। আলেকজেন্দ্রিয়ায় এই সময়ে ভয়াবহ মড়ক চলছিল। কোনো জীবাণু থেকে এ ভীষণ ব্যাধি উৎপন্ন হয় কিনা ফরাসী দেশের পাস্তুর এবং জার্মানীর রবার্ট কক্ উভয়েই এবিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। কক্ নিজেই একজন সহকর্মীকে নিয়ে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সহ মিশর দেশে রওনা হন। পাস্তুর তখন জলাতঙ্ক রোগের প্রতিকারের উপায় নির্ধারণে ব্যাপৃত ছিলেন ; কাজেই নিজে না গিয়ে রক্স এবং টুইলিয়ারকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। ফ্রান্স ও জার্মানীর এই উভয় কমিশনই কলেরার জীবাণু আবিষ্কারের জন্যে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে দেন। কক্ এবং তাঁর সহকর্মী গ্যাফ্‌কী আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত্র মিশরীয় কলেরারোগীর মৃতদেহগুলিকে ব্যবচ্ছেদ করে তাদের রক্ত ও অন্যান্য পদার্থের রস কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, মুরগী প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের প্রাণীদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু ওই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী বৈজ্ঞানিক দল যখন কলেরার উৎপত্তির কারণ জানবার জন্যে প্রাণপাত করছিলেন, ঠিক সে সময়ে অকস্মাৎ রহস্যজনকভাবে সেই ভীষণ মহামারী ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল। কাজেই কক্ এবং তাঁর সহকর্মী বার্লিনে ফিরে গেলেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন মৃতদেহ থেকে অনেক জীবাণু সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে জীবাণুগুলি দেখতে ঠিক কমার (,) মত। বার্লিনে ফিরে গিয়ে তিনি মিনিস্টার অব স্টেটের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতে লিখলেন—আমি অনেক কলেরা রোগীর শরীর থেকেই এক রকমের জীবাণু পেয়েছি; কিন্তু এখনও প্রমাণ করতে পারি নি যে, এগুলোই কলেরা রোগের উৎপত্তির কারণ। কাজেই আমাকে কলেরা রোগের আস্তানা ভারতবর্ষে পাঠানো হোক—যেখানে আমি এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত পরীক্ষা করতে পারবো।

অবশেষে কক্ বার্লিন থেকে কলকাতা আসেন এবং প্রত্যেকটি কলেরা রোগীর শব-ব্যবচ্ছেদ করে কমা-ব্যাসিলাসের সন্ধান পান। পরে তিনি এই জীবাণুগুলিকে পরীক্ষাগারে বংশবৃদ্ধি করবার উপায় উদ্ভাবন করে তাদের জীবন-রহস্যের যাবতীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে রবার্ট কক্ তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করবার পর মিউনিকের পেটেনকফার প্রমুখ প্রাচীনপন্থী বৈজ্ঞানিকেরা একে সম্পূর্ণ বাজে ব্যাপারে বলে উড়িয়ে দিলেন। পেটেনকফারের অনুরোধক্রমে কক্ একটা কাচের টিউব ভর্তি কলেরা জীবাণু তাঁকে পাঠিয়ে দেন। ককের আবিষ্কার মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্যে পেটেনকফার সেই সবগুলি কলেরা-ব্যাসিলাস গিলে ফেললেন। কী যে অদ্ভূত ব্যাপার ঘটলো—কেউ বলতে পারে না—পেটেনকফারের কিছুই হলো না। পেটেনকফার তখন জোরগলায় প্রচার করতে লাগলেন—জীবাণু কর্তৃক কলেরা উৎপন্ন হয় না। কক্ বললেন—কমা-ব্যাসিলাস ছাড়া কলেরা হতে পারে না; কিন্তু অতগুলি কলেরা জীবাণু খেয়ে কেন একটা লোকের কিছুই হলো না—এ অতি অদ্ভুত রহস্য! পরে ক্রমশ ক্রমশ দেখা গেল—ককের আবিষ্কৃত তথ্যই ঠিক; কিন্তু পেটেনকফারের ঘটনা থেকে আর একটা নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। দুষ্ট রোগজীবাণু আকাশে-বাতাসে সর্বত্র রয়েছে। এই বীজাণু প্রত্যেকের শরীরেই প্রবেশ করে থাকে; কিন্তু কেউ কেউ রোগাক্রান্ত হয়, অনেকে আবার রোগাক্রান্ত হয় না। এর প্রধান কারণ হলো—শরীরে স্বাভাবিক

রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা। পেটেনকফারের ক্ষেত্রেও বোধহয় তা-ই হয়েছিল। মোটের উপর কমা ব্যাসিলাস যে কলেরা রোগের উৎপত্তির কারণ এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। কমা ব্যাসিলাসকেই আজকাল বলা হয়—কলেরা ভিব্রিও।

ডিসেম্বর, ১৯৫২

বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ ব্যাধি

যতরকমের ব্যাধি মনুষ্য-শরীরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাদের মধ্যে কুষ্ঠরোগের মত এমন কুৎসিত এবং কুখ্যাত ব্যাধি আর নেই। টাইফয়েড, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতির মতো মারাত্মক না হলেও এ রোগ একবার দেহে প্রবেশ করলে তাকে বিকলাঙ্গ করে চিরজীবনের মতো পঙ্গু করে দেয়। অধিকন্তু কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে কেউ কোনো রকমের সম্পর্ক রাখতে চায় না; কাজেই মনুষ্য সমাজের বহির্ভূত হয়েই তাকে অভিশপ্ত জীবন অতিবাহিত করতে হয়। স্পর্শ করা তো দূরের কথা, কুষ্ঠরোগীকে দেখলেই অনেকের মনে এমন একটা ঘৃণামিশ্রিত অস্বাভাবিক ভাবের উদয় হয় যে, সত্যিকার ভূত দেখলেও হয়তো ততটা অস্বস্তির উদ্রেক হয় না। মৃত ব্যক্তিকে কবর দেবার সময় খৃষ্টানী মতে যেমন প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করা হয়, মধ্যযুগে ইউরোপে কুষ্ঠরোগীর উপর সেরূপ প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করে তাকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হতো। লোকালয়ের বাইরে কুষ্ঠরোগীদের জন্যে নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে তাদের লোকজনের সঙ্গে মিশবার সুযোগ দেওয়া হতো না। আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক মনে হলেও এ প্রথা কিন্তু ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল থেকে কুষ্ঠরোগ দূরীকরণে অনেকটা সহায়তা করেছিল। অবশ্য আজও পৃথিবীর অনেক স্থলেই কুষ্ঠরোগের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে

পৃথিবীতে আজও প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ লোক কুষ্ঠরোগে ভুগছে। এর মধ্যে ভারতবর্ষের কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাই হবে প্রায় ১০ লক্ষ। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। কিছুকাল আগে [?] কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত গবেষণা বিভাগের ডাঃ ধর্মেন্দ্র বাংলায় কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে এক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া সমস্যার কথাই আমরাই অহরহ শুনতে পাই; কিন্তু কুষ্ঠব্যাধি সমস্যাও যে বাংলার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে, সেকথা একবারও চিন্তা করি না! ডাঃ ধর্মেন্দ্রের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, সারা বাংলা দেশে বর্তমানে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা হবে প্রায় ২০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০। এর মধ্যে মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, রংপুর [বর্তমান বাংলদেশ প্রজাতন্ত্রে] এবং জলপাইগুড়িতেই এই রোগের প্রভাব দেখা যায় বেশি। জনসংখ্যার অনুপাতে উপরোক্ত জেলাগুলির শতকরা ১ থেকে ৩ জন লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই হিসাবে ২৪পরগণার মধ্যবর্তী জেলাসমূহ—কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় [শেষোক্ত পাঁচটি জেলা এখন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রে। ড. ধর্মেন্দ্রর সমীক্ষাটি অবিভক্ত বাংলা নিয়ে রচিত।] ·৫ হইতে ·৯% এবং যশোহরের পূর্ব এবং দক্ষিণ জেলাসমুহ, খুলনা, বরিশাল ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামে ৫% এর কম লোককে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

কুষ্ঠরোগ যতই কুৎসিত বা সংক্রমণ শক্তিতে যতই ভীষণ হোক—এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সমাজের প্রত্যেকেরই সাহায্য এবং সহানুভূতি পাওয়ার অধিকারী। কাজেই এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কুষ্ঠরোগের মধ্যে প্রকারভেদ আছে—সবগুলি না হলেও এদের কতকগুলি খুবই সংক্রামক। অনেকে শ্বেতী বা ধবল রোগকে শ্বেতকুষ্ঠ বলে থাকেন; কিন্তু সেটা ঠিক নয়—শ্বেতী মোটেই কুষ্ঠ জাতীয় রোগ নয়! একত্রে চলাফেরা, এক বিছানায় শোওয়া, এক

পাত্রে আহার প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ অপরের দেহে সংক্রামিত হয়ে থাকে। এজন্যে কুষ্ঠরোগীকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখাই রোগের প্রসারতা বন্ধ করবার প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এতে সফলতা অর্জন করতে হলে বহু অর্থের প্রয়োজন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে দেখা যায়—সারা বাংলা দেশে দেড়শর বেশি কুষ্ঠ চিকিৎসাগার নেই; এ সকল চিকিৎসাগারে ১৯৪৩ এবং ৪৪ সালে ২০,০০০ রোগী চিকিৎসিত হয়েছিল। তাছাড়া সরকারী এবং বেসরকারী মিলিয়ে মাত্র ৭টি ইনষ্টিটিউশন আছে। এগুলিতে মোট ৮০০ রোগীর স্থান সংকুলান হয়। কাজেই রোগের ব্যাপকতা অনুসারে প্রত্যেক স্থানেই সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে আরও অধিক সংখ্যক কুষ্ঠাশ্রম ও চিকিৎসাগারের প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৮৭৯ সালে কোপেনহাগেনের ডাঃ জি. এ. হানসেন আবিষ্কার করেন যে, লেপ্রা ব্যাসিলাস নামক এক জাতীয় জীবাণুই কুষ্ঠব্যাধি উৎপত্তির কারণ। সে থেকে আজ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে অন্য কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কারের খবর পাওয়া যায় নি। ডাঃ বোপার্থি অনুমান করেন যে, কয়েক রকম কীটপতঙ্গ, বিশেষ করে ঘরো মাছিরাই এই রোগের বীজাণু বহন করে অন্যের শরীরে এই রোগ সংক্রামিত করে থাকে। 'লেপ্রা ব্যাসিলাস" গাত্রচর্ম, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী অর্থাৎ মিউকাস মেমব্রেন এবং লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডগুলিকেই বিশেষভাবে আক্রমণ করে। রোগের পরিণত অবস্থায় দেহের মাংস-তন্তুগুলি স্থানে স্থানে প্রদাহ-উৎপাদনকারী গুটিকারূপে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই গুটিকাকার কোষগুলির মধ্যেই লেপ্রা ব্যাসিলাসগুলিকে কখনও পুঞ্জীভূতভাবে, কখনও বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করবার পর রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হতেও অনেক কাল অতিবাহিত হয়ে যায়। রোগের আক্রমণ চরমে উঠতে যেমন বহুকাল অতিবাহিত হয় প্রশমিত হতেও তেমনি বহুকাল লেগে থাকে। রোগজীবাণু দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রভাব বিস্তার করবার পর চামড়া মোটা বা পুরু হতে

আরম্ভ করে ; তার পরেই গুটিকার মতো পদার্থ আবির্ভূত হয়। গুটিকাগুলি অনেকটা তলতলে, প্রথমে একটু লালচে পরে বাদামী রঙে পরিবর্তিত হয়। গুটিকা সমন্বিত কুষ্ঠরোগে মুখে, পিঠে, হাতে, পায়ে কালচে, লাল অথবা তামাটে রঙের চক্রাকার অথবা লম্বাটে দাগ আত্মপ্রকাশ করে। পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুটিকাগুলি ফেটে গিয়ে ক্ষত উৎপন্ন করে। ঘা আর শুকোতে চায় না। গলা, নাকের শ্লেষ্মানিঃস্রাবক পাতলা পর্দাগুলি পুরু হয়ে যায় ; ফলে শ্বাসক্রিয়া ও স্বরযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে। ভ্রূর চামড়া এবং নাক, কান পুরু হয়ে ঝুলে পড়ে ; চামড়ার স্পর্শানুভূতি এবং মাংসপেশীর শক্তি ক্রমশ কমতে থাকে। নখগুলি শক্ত হয়ে ওঠে এবং বেঁকে যায়। পায়ে গভীর ক্ষত দেখা দেয়। হাত ও পায়ের আঙুলের ডগাগুলি খসে পড়ে। তারপর আসে পেশীসমূহে, বিশেষ করে মুখে অবশতা বা প্যারালিসিস। কুষ্ঠব্যাধির আক্রমণ ২০ থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত চলতে দেখা যায়। অতি প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে কুষ্ঠব্যাধির প্রভাব বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে কুষ্ঠব্যাধির বিস্তৃত লক্ষণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে লিখিত সুশ্রুত সংহিতাই তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। সুশ্রুত সংহিতায় চাল-মুগরার তেলই কুষ্ঠরোগের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক বলে বর্ণিত হয়েছে। এই চালমুগরার তেল সর্বত্রই এই কুষ্ঠরোগে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজও ভারতীয় সেই প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যার অপূর্ব আবিষ্কার, চালমুগরার তেলই কুষ্ঠরোগ প্রতিকারে পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রভেদ এই যে, পূর্বে খানিকটা অবিশুদ্ধ চালমুগরার তেল রোগীকে খাওয়ান হতো, এখন সেখানে পরিশুদ্ধ তেল বা তা থেকে প্রস্তুত কোনো কোনো উপাদান শরীরের ভিতরে ইনজেক্শন করে দেওয়া হয়। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী ন্যাস্টিন প্রভৃতি অনেক রকমের জিনিস প্রয়োগ করেও কুষ্ঠব্যাধির কোনই প্রতিকার সম্ভব হয় নি। অবশেষে পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, চালমুগরার তেলেরই এই রোগ প্রশমনের অনেকটা ক্ষমতা

রয়েছে। ১৯১০ সাল থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়! চালমুগরার তেল খাওয়ালে রোগ প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু একটা ন্যক্কারজনক ভাব উৎপন্ন হয় বলে সবসময় খাওয়ানো সুবিধাজনক হয়ে ওঠে না। ফিলিপাইনে ভিক্টর জি হিসার মাংসপেশীতে এই তেল বার বার ইন্‌জেকশন করে অনেক ভালো ফল দেখতে পান। ১৯১৬ থেকে ১৭ সালের মধ্যে এর ব্যবহারে আরও উন্নতি সাধিত হয়। এল. রোজারস্ চালমুগরা তেল থেকে প্রস্তুত রাসায়নিক পদার্থ-বিশেষ মাংসপেশী অথবা রক্তনালীতে ইনজেক্‌শন করে লেপ্রা ব্যাসিলাস ধ্বংস করতে আশ্চর্য সফলতা লাভ করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যেখানে ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হয় সেখানেই কেবল জীবাণুগুলি মরে যায়, অন্যত্র তেমন কোনো ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। তারপর হনলুলুতে ডিন এবং হোলম্যান অন্য উপাদান যোগে এই ইনজেক্‌শন প্রথার অনেক উন্নতি সাধন করেন। ভারতবর্ষে ডাঃ মুইর সোডিয়াম হিডনোকারপেট (চালমুগরা থেকে প্রস্তুত) ব্যবহার করে আরও সুফল লাভ করেছেন। মোটের উপর কেবল ওষুধ ব্যবহারই এই রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় নয়। নিয়মিত পানাহার, মুক্তবায়ু, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকর খাদ্য এই রোগ প্রশমনে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

ডিসেম্বর, ১৯৫২

সালফোট্রন

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে আফ্রিকার ট্রানস্কি অঞ্চলের অধিবাসীগণের মধ্য হইতে কুষ্ঠব্যাধি দূরীকরণের প্রচেষ্টায় সালফোট্রন নামে নূতন একটি ঔষধ ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছে। [মার্কিন] যুক্তরাষ্ট্রে এই ঔষধটি আবিষ্কৃত হয়।

সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

কৃত্রিম জীবন সৃষ্টির সম্ভাবনা

বৃস্টলের খবরে প্রকাশ—কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিন ল্যাবরেটারীর ডাঃ ক্রীক উদ্ভিদবিদ্, পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্ ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের এক সভায় ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ বিজ্ঞানীরা হয়তো শীঘ্রই টেস্ট টিউবে কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন।

সমবেত বিজ্ঞানীদের নিকট এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া তিনি বলেন, জীবকোষের মূল উপাদান ডিসোক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিডকে আলাদা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যে সকল পদার্থ লইয়া এই অ্যাসিড গঠিত হইয়াছে, সেগুলি শোধন করিয়া জীবন্ত পদার্থরূপে টেস্ট টিউবে মিশ্রিত করা হইবে।

সম্মেলনে আগত অপর একজন বিজ্ঞানী বলেন, পুরুষানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ কিভাবে ঘটে, তাহার রহস্যও উদঘাটিত হইতে চলিয়াছে। একথা বিশ্বাস করিবার মতো প্রমাণ রহিয়াছে যে, প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের যৌগিক প্রক্রিয়াই পুরুষানুক্রমিক আকৃতি ও প্রকৃতির মূলে কাজ করিতেছে।

ডিসেম্বর, ১৯৫২

রেডার

Radio Detection And Ranging-এর প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষর কয়টি নিয়ে রেডার কথাটি হয়েছে। রেডার যন্ত্র থেকে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে বেতার তরঙ্গ দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই বেতার তরঙ্গের গতিপথে যদি কোনো বস্তু থাকে তবে বেতার তরঙ্গ ঐ বস্তুতে প্রতিহত হয়ে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি মাইল বেগে ফিরে এসে রেডারের পর্দার উপর প্রতিফলিত হয়। রেডার থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গের গতিপথে যদি কোনো জাহাজ, বিমান বা অন্য কোনো বস্তু থাকে তবে বেতার তরঙ্গ সেখানে প্রতিফলিত হয়ে আলোর গতিবেগে আবার রেডার যন্ত্রে ফিরে আসে। তখন রেডারের

পর্দার উপরে কালো দাগের মতো বস্তুর একটা ছবি ফুটে ওঠে। এই এই ছবি দেখে বলা যায় যে, দূরে দৃষ্টির অন্তরালে কোনো জিনিস রয়েছে। দূরের এই বস্তু কত দূরে রয়েছে, কোন দিক যাচ্ছে বা আসছে তাও সঠিক ভাবে নির্দেশ করে দেয় এই রেডার যন্ত্র। মোটা-মুটিভাবে এই হলো রেডারের কর্মপদ্ধতি।

যুদ্ধ এবং শান্তি সব সময়েই রেডার যন্ত্রের ব্যবহার আছে। যুদ্ধের-সময় রেডার যন্ত্র শত্রুপক্ষের বিমান দেখলেই মিত্রপক্ষকে সতর্ক করে দেয়। শত্রুপক্ষের কোনো ঘাঁটি যদি ধোঁয়া বা কুয়াশায় ঢাকা থাকে তবে মিত্রপক্ষের বৈমানিকদের কাছে সেই ঘাঁটির সঠিক সন্ধান জোগায়। আবার শান্তির সময় জাহাজ ও বিমানকে দূরে—দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত বিপজ্জনক পদার্থের সঠিক অবস্থান এবং গতিবিধির খবর এনে দিয়ে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে, নিরাপদে অবতরণক্ষেত্রে নামবার কাজে বিমানকে সাহায্য করে, শত শত মাইল উর্ধ্বে প্রেরিত রকেটের গতিবিধির সন্ধান ক্রমাগত প্রেরককে জানাতে থাকে।

এপ্রিল, ১৯৫৫

অরোরা-বোরিয়ালিস

আমরা জানি যে, মেরু অঞ্চলে ৬ মাস দিন আর ৬ মাস রাত্রি। রাত্রির ৬ মাস মেরুর আকাশে এক অদ্ভুত আলোর ছটা দেখা যায়। এই আলোক ছটার নাম অরোরা বোরিয়ালিস। এই নাম প্রথম ব্যবহার করেন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ও দার্শনিক—গ্যাসেস্‌ডি, ১৬২১ সালে। অরোরা বোরিয়ালিস কথাটির অর্থ হলো উত্তরের প্রভাত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জানা যায় যে, উত্তর মেরুর মতো দক্ষিণ মেরুর আকাশেও এই জ্যোতি দেখা যায়। দক্ষিণ মেরুর আকাশে এই জ্যোতির নাম অরোরা অস্ট্রেলিস। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, পৃথিবীর চুম্বকশক্তির গোলযোগ এবং সূর্যের কলঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে এই দু-রকম অরোরারই সম্বন্ধ আছে।

এপ্রিল, ১৯৫৫

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বৈজ্ঞানিক আলোচনার একটি ধারা আজ বিজ্ঞান-সাংবাদিকতা নামে স্বীকৃত। পারমাণবিক যুগ থেকে মাত্র পাঁচ দশকের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিকাশের ফলে সাধারণ মানুষও আজ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন। আর এই আগ্রহ নিছক জানবার আগ্রহ নয়, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনও তার পেছনে ক্রিয়াশীল। তাই পপুলার সায়েন্স বা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের সর্বত্র আজ বিপুল চাহিদা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর বহুদিন আগেই বলেছিলেন। সাধারণ মানুষের "কতকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে মানুষের জীবনযাত্রাই আজকাল অচল হইয়া পড়ে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, সকল শাস্ত্রেরই মধ্যে খানিকটা অংশ আছে। যাহা সকলের পক্ষেই জ্ঞাতব্য সেইটুকু না জানিলে মূর্খ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে হয় তাহা নহে। ......জী ব ন র ক্ষা ও সং সা র যা ত্রা র জ ন্য ও নি তা ন্ত আ ব শ্য ক হ ই য়া প ড়ি য়া ছে।"

সাধারণভাবে, এই কাজ দু'ভাবে করা যায়—বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা এবং বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তির নানা তথ্য, বিতর্ক সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ। বিজ্ঞান সাংবাদিকতা আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার ইতিহাস বাংলায় বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখালেখির শুরুর দিন থেকেই লক্ষ্য করা গেলেও লেখকরা কিন্তু বিজ্ঞান সাংবাদিকতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। প্রকৃতঅর্থে 'বিজ্ঞান সাংবাদিকতার' জন্মও বেশি দিনের নয়। আমাদের দেশে এই বিষয়ে কাজ হলেও যথার্থ অর্থে আমরা পেছিয়ে আছি। ১৯৮৪ সালে প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া নয়াদিল্লীতে 'সাউথ এশিয়ান সায়েন্স রাইটিং ওয়ার্কশপ'-এর আয়োজন করেছিলেন। সেই ওয়ার্কশপ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সংবাদপত্রে বিজ্ঞান-সাংবাদিক

পদ সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্রগুলিকে অনুরোধ করা হবে। এই প্রস্তাবের তাৎপর্য আমাদের সংবাদপত্রগুলি সম্যকভাবে অনুধাবন যদি করেও থাকেন—কিন্তু এখনো তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। সপ্তাহে একদিন বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ বা টুকিটাকি সংবাদ পরিবেশন করেই দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। প্রকাশিত সংবাদের পরবর্তী ফলাফলের ধারাবাহিকতা রক্ষা হচ্ছে না।

এই সমস্যা 'সমাচার দর্পণ' 'তত্ত্ববোধিনী' 'বঙ্গদর্শন' থেকে হাল আমলের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পর্যন্ত চলে আসছে। কেন চলে আসছে, কীভাবে তার প্রতিকার সম্ভব তা' আমাদের আলোচ্য নয়। বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার গুরুত্ব, আমাদের দেশে তার রূপ ও সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করে দেবার জন্য বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক গোপালচন্দ্রের কিছু বিজ্ঞান-সংবাদ বা সংবাদ-নিবন্ধর সংকলন প্রকাশ করা হলো।

বলা দরকার গোপালচন্দ্রও প্রয়োজনের তাগিদে 'বিজ্ঞান-সাংবাদিক' হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন তিনি স্বনামে বা অস্বাক্ষরিত নানা বিজ্ঞান-সংবাদ রচনা করেছিলেন—যদিও আধুনিক অর্থে তিনিও বিজ্ঞান সাংবাদিক ছিলেন না। ছিলেন না বলা ভুল—তিনি সচেতন ভাবে বিজ্ঞান-সাংবাদিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলেন নি। যেটুকু কাজ করেছিলেন তা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর আদি পর্বে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবার তাগিদেই।

আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর মাত্র দু'টি বছর থেকে তাঁর স্বাক্ষরিত ও অস্বাক্ষরিত কিছু বিজ্ঞান-সংবাদ সংকলন করলাম এই গ্রন্থে। অস্বাক্ষরিত সংবাদ সনাক্তকরণে নানা অসুবিধা ছিল। তবে, যে দু'বছরের সংখ্যাগুলি থেকে সংবাদ সংকলিত হয়েছে তখন প্রায় এককভাবে গোপালচন্দ্রকে সত্যেন্দ্রনাথ-এর পরামর্শে পত্রিকা সম্পাদনা করতে হয়েছিল। অনেক সময় নির্দিষ্ট তারিখে (প্রতি ইংরেজি মাসের ১ তারিখে) পত্রিকা প্রকাশ করবার প্রয়োজনে শূন্যস্থান ভরাবার জন্য 'সঞ্চয়ন' 'বিজ্ঞান-সংবাদ' ও নিয়মিত বিভাগ 'বিবিধ'-এ কচিৎ 'গ'

আদ্যাক্ষর দিয়ে এবং সঙ্গতভাবেই স্বাক্ষরবিহীনভাবে বিজ্ঞান-সংবাদ পরিবেশন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। পরিকল্পনার অভাব, সরাসরি তথ্য সংগ্রহের অসুবিধার জন্য মূলত ইংলণ্ড, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার দূতাবাসগুলির প্রেরিত বুলেটিন (বিজ্ঞান সংবাদেরও আলাদা বুলেটিন গোপালচন্দ্রের কাগজপত্রের সংগ্রহে লক্ষ্য করা গেছে) এবং সংবাদপত্রই ছিল সংবাদের তথ্য-সূত্র। তবে গোপালচন্দ্রের পঁচানব্বইতম জন্ম-দিনে ১ আগস্ট ১৯৯০ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি অনুসারে) প্রকাশিত এই সংকলন গ্রন্থ পাঁচের দশকের মাঝামাছি পর্যন্ত বাংলায় বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার রূপরেখাটি বুঝতে সাহায্য করবে এবং গবেষক-জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যের নিরলস সেবক গোপালচন্দ্রের আজ পর্যন্ত আনালোচিত দিক বিজ্ঞান-সাংবাদিকতায় গোপালচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়ণ করতে সাহায্য করবে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার কোনো কোনে সংবাদ-এর প্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া হয়েছে। সংকলিত সমস্ত সংবাদের প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা এই সংকলনের পরিকল্পনা থেকে রূপায়নের সংক্ষিপ্ত সময়সীমা ও সংকলকের অজ্ঞতার জন্য সম্ভব হলো না।

সমুদ্র হইতে হিমালয়ের উত্থানের প্রমাণ

ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, যে-শিলারাশির দ্বারা মূল, মধ্য হিমালয় পর্বতমালা এবং শিবালিক পর্বতমালা গঠিত তা' (মধ্য ও বহির্হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত) সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছে। এই উত্থানের শুরু হয় প্রায় ছয় কোটি বছর আগে —ইয়োসিন যুগে। ছু'কোটি বছর পর মায়োসিন যুগে পরবর্তী উত্থান পর্ব এবং তার শেষ হয় প্রায় এক কোটি কুড়ি বছর আগে প্লায়োসিন যুগে। আর শিবালিক পর্বতমালা বর্তমান আকৃতি লাভ করে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে।

কোন্ সমুদ্র থেকে হিমালয়ের উত্থান হয়েছিল এ-প্রশ্নের উত্তরে ভূতাত্ত্বিকদের মত হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে একটি সমুদ্র ছিল যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এই সমুদ্রের নাম দিয়েছেন টেথিস সমুদ্র।

ঝাঁসিতে অশোকের নতুন শিলালিপি আবিষ্কৃত

এই সংবাদে বলা হয়েছে 'হায়দরাবাদের মাস্কী শিলালিপি ছাড়া অন্য কোন শিলালিপিতে মহারাজ অশোকের নাম পাওয়া যায় নাই।'

এই তথ্য অনৈতিহাসিক। কারণ জেমস প্রিনসেপ প্রাচীনতম ভারতীয় লিপি ব্রাহ্মীতে খোদিত অশোকের একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানান যে, তাতে 'দেবনামপিয় পিয়দশ্শী' দুটি শব্দ পেয়েছেন। অবশ্য তখনো পর্যন্ত এই 'দেবনামপিয় পিয়দশ্শী'ই যে সম্রাট অশোক সে-সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ছিল। ১৮৩৭ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত নানা শিলালিপি অনুশাসন এবং বৌদ্ধ বিবরণীর পাঠোদ্ধার ও পর্যালোচনা করে 'দেবনামপিয় পিয়দশ্শী'ই যে মৌর্য বংশের সম্রাট অশোক সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হয়। তার আগে পর্যন্ত অশোক মৌর্য বংশের একজন রাজা হিসাবে মাত্র চিহ্নিত হতেন।

অশোকের এ-যাবৎ প্রাপ্ত শিলালিপিগুলি ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী (আরামাইক লিপি থেকে উদ্ভূত), গ্রীক এবং আরামাইক লিপিতে খোদিত।

অশ্বমেধ যজ্ঞের স্থান খনন

এই উৎখননটি হয় জগৎগ্রামে। তৃতীয় শতকের কয়েকটি অশ্বমেধচৈত্য উৎখননের ফলে প্রাপ্ত বহু ইঁটে খোদিত লিপি পাঠ করে জানা যায় শীলবর্মা নামক জনৈক রাজা এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

রাজা হেরোডের প্রাসাদ

কংস-কৃষ্ণ কাহিনীর মতোই হেরোড-যীশুর কিংবদন্তীর কথা আমরা জানি। কিন্তু হেরোডের মৃত্যু তারিখ জানা গেছে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক। আর যীশু জন্মেছিলেন খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে গ্যালিলি নামক কৃষিপ্রধান অঞ্চলের নাজারেথ জনপদে, বেথলহেমে নয়। যা-হোক, সংবাদে প্রকাশিত উৎখননের ফলে শুধু হেরোডের প্রাসাদ নয় আরো নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যাচ্ছে। যা আমাদের এতোদিনের জানা-আজানা নানা তথ্য-সংবাদ-কিংবদন্তী বিশ্বাসকে ভাঙছে এবং কখনো বা সমর্থনের পাথুরে প্রমাণ দিচ্ছে। জোসেফাস ফ্লেভিয়াস বা ফ্লাভিয়ুস যোসেফুস-এর ৯৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'ইহুদীদের পুরাবৃত্ত'র প্রামাণিক সংস্করণ দুর্লভ। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে পরবর্তীকালে লিপিকররা বহু অংশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বাদ দিয়েছেন ও সংযোজন করেছেন। বইটির একটি সংকলিত ইংরেজি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন M. I. Finley, নয় খণ্ডে Jewish War, and other Selections from Flavius Josephus'। ফ্লেভিয়াস লিখেছেন কি-না জানি না, কিন্তু J. C. Stobart-এর কথায় হেরোড 'even shared the favours of Cleopetra'। যাহোক এই উৎখননের ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বিবরণ পাওয়া

যাবে ১৯৭৬-এ প্রকাশিত ইগায়েল ইয়াদিন-সম্পাদিত 'Jerusalem Revealed : Archaeology in the Holy City, 1968-1914' গ্রন্থে।

মিশরে নূতন পিরামিড

এই নূতন পিরামিডটিই প্রমাণিত হয়েছে মিশরের প্রাচীনতম পিরামিড।

খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে ফারাও জোসে-র সময় মিশর প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে এবং জোসের নির্দেশেই পিরামিড নির্মাণের শুরু। সবচেয়ে বিশাল পিরামিড হচ্ছে খেওপ্ স্-এর পিরামিড বা কুফু পিরামিড। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৬০০ অব্দে ১৫০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট পিরামিডটি নির্মিত হয়েছিল। মতান্তরে ১৬৯০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। ইংরেজিতে উচ্চারণ গ্রেট কিওপ্স্ পিরামিড।

সাকারা (Sakkara) নামটির উদ্ভব মিশরীয় দেবতা Seker থেকে। আবিষ্কৃত পিরামিডটি সম্রাট জোসে-র স্টেপ পিরামিড। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে খ্রীঃ পূঃ 2980 সালে চুনা পাথরে তৃতীয় রাজবংশের রাজা জোসে-র (Djoser) রাজত্ব-কালে রাজার বন্ধু এবং মিশরের প্রধান স্থাপত্যশিল্পী ইমহো-টেপ এটির পরিকল্পনা করেন। এটিই মিশরের প্রাচীনতম পিরামিড, বিশাল এর আয়তন, বর্তমানে ভগ্নপ্রায়। তাই পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ১৭৪০০ ফুট × ৭৮৫ ফুট ক্ষেত্রফলের পুরো স্থানটি ৩৩·৩০ ফুট উঁচু প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ ছাড়া আজ কিছু নেই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর নির্মিত কুঠার

প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সংবাদের সমর্থনে বাংলাদেশে পুরা প্রস্তর-যুগ বা নব্য প্রস্তর যুগের সন্দেহাতীত নিদর্শন পাওয়া গেছে এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন বলে জানা নেই। তবে দামোদর নদের তীরে বীরভানপুর গ্রামে উৎখননের ফলে অসংখ্য স্ফটিক ও অন্যান্য গুঁড়ো পাথরের তৈরি ক্ষুদ্রাশ্মীয় যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। তাম্রশ্মীয় যুগের আগের বাংলার ইতিহাস কাঠামো গঠনের প্রত্নতাত্ত্বিক-উপাদান উপকরণ এখনো পাওয়া যায় নি।

কুমেরু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অভিযান / দক্ষিণ মেরু অভিযান

প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে সুমেরু ও কুমেরু অভিযান অধুনা যাকে বলি আণ্টার্কটিকা অভিযান-এর মূলত ৫টি পর্ব আছে।

প্রথম: পৃথিবীতে এখন ৭টি মহাদেশ। এই সপ্তম মহাদেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ মানুষের কাছে ছিল টেরা ইনকগ্‌নিটা বা অজানা মহাদেশ। পামার, বেলিংসহাওয়েন, ব্র্যান্সফিল্ড-এর কালে প্রথম পর্বের সমাপ্তি। দ্বিতীয় অভিযাত্রী যুগ: পাল তোলা জাহাজে ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের। এই যুগের অভিযাত্রীদের মধ্যে স্কট-শ্যাকলটন-আমুণ্ডসেন-কুকের রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা সকলেই জানা। এরা ছাড়াও নাম করতে হয় রস, ওয়েডেল, উইলকিন্স, দ্যরভিল, গেরলাশ, ড্রাইগালস্কি, মসন-এর।

উনিশ শতকের শেষ দশকের গোড়ায় (১৮৯২-৯৩?) হেনরিক বুল 'আণ্টার্কিক' জাহাজে অভিযান করেন। নর-

ওয়ের বিজ্ঞানী কারস্‌টেন বর্চগ্রেভিঙ্ক সাধারণ নাবিক হিসাবে এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ। অভিযান থেকে ফিরে এসে ১৮৯৫ সালে আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সম্মেলনে কুমেরুতে বৈজ্ঞানিক অভিযানের গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে একমত হন। এটা একটা বড়ো ব্যাপার।

এরপর ১৮৯৭তে অদ্রিয়ান গেরলাশের নেতৃত্বে যে বেলজিয়ান অভিযান হয় প্রকৃতপক্ষে সেটাই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক অভিযান। কারণ এর সদস্যরা ছিলেন বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক। তৃতীয়ঃ ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর বৈজ্ঞানিক অভিযান শুরু হয়। চতুর্থ ঃ ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর অভিযানের চরিত্র গেলো পাল্টে। পৃথিবীর মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। দেখা দিয়েছে নতুন শক্তি। তারা চাইছেন পৃথিবীর এবং টেরা ইনকগ্‌নিটার ভাগজোক। নয়া উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং অজানা মহাদেশকে কুক্ষিগত করবার জন্য চললো এই পর্বের অভিযান। ১৯৪৬ সালে আমেরিকা রিচার্ড বায়ার্ড-কে দলপতি করে ৪ হাজার কর্মী, ১৩টি জাহাজ দিয়ে কুমেরু অভিযান করালেন। এই অভিযান 'অপারেশন হাইজাম্প' নামে খ্যাত। ১৯৪৭ সালে প্লেন, হেলিকপ, আইসব্রেকার, স্নো-ট্র্যাক্টর নিয়ে হলো 'অপারেশন উইণ্ডমিল'।

এদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঘোষণা করলেন আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে ১৯৫৭-৫৮ সালে। এই উপলক্ষে গৃহীত পরিকল্পনায় আন্টার্কটিকা সমীক্ষা খুবই গুরুত্ব লাভ করলো। তারই প্রস্তুতিতে বায়ার্ড-এর নেতৃত্বে হলো অপারেশন ডীপফ্রিজ। এই সময়ই 'কে সেরা সেরা' নামে একটি স্কি-প্লেনে কনরাড শীন দক্ষিণ মেরু অবতরণ করেছিলেন।

পঞ্চম পর্ব : আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, নরওয়ে, বেলজিয়াম, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়া এই ১২টি দেশ আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবর্ষে আণ্টার্কটিকা-কে সর্বতোভাবে জানবার জন্য অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এই অভিযাত্রী দল ৫৫টি গবেষণা কেন্দ্র খুলেছিলেন। তবে দক্ষিণ মেরুতে মাত্র ২টি। আমেরিকা খোলে আমুণ্ডসেন-স্কট কেন্দ্র এবং সোভিয়েট ভূ-চৌম্বক দক্ষিণ মেরুতে খোলে ভস্টক। হিলারী ও ভিভিয়ান ফুকস দু'জনে আণ্টার্কটিকার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরিক্রমণ করেছিলেন। তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুতে আমুণ্ডসেন-স্কট কেন্দ্রে। (উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু বা সুমেরু-কুমেরু হচ্ছে ভৌগোলিক মেরু। এছাড়াও আছে চৌম্বক মেরু ও ভূ-চৌম্বক মেরু)।

এই অভিযানের ফলে ১৯৬১ সালে ওয়াশিংটনে অভিযাত্রীদেশগুলি ছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যরা আণ্টার্কটিকা নিয়ে একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তির মেয়াদ ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে কোনো দেশ বা জাতি আণ্টার্কটিকার কোনো অঞ্চল বা সম্পদ এককভাবে দাবী করতে পারবেন না। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে কী হবে তা লক্ষ্য করবার বিষয়।

প্রসঙ্গত ভারতবর্ষ প্রথম অভিযান করে ডঃ সৈয়দ জহুর কাশিম-এর নেতৃত্বে। 'অপারেশন গঙ্গোত্রী' নামে এই অভিযান পরিচিত হয়। ভারতের তৃতীয় অভিযানে বাঙালি কন্যা সুদীপ্তা সেনগুপ্ত অংশগ্রহণকারী ছিলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন চমৎকার একটি বই আণ্টার্কটিকা। ১৯৮১ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। সংকলক-এর তথ্যসূত্র এই বইটি।

নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার

এই সংবাদ প্রকাশিত হবার পর মহাজগৎ সম্পর্কে গবেষণা নতুন মাত্রা পেয়েছে। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ, আরো শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং তত্ত্বগত ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার আমাদের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। নক্ষত্র-জগৎ সম্পর্কে পুরনো ধারণা সংশোধিত হচ্ছে।

আরাইজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুয়ার্ড মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রেডি স্মিথ জানিয়েছেন যে পৃথিবী থেকে প্রায় ১০০ আলোক বৎসর দূরে একটি নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। নক্ষত্রটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় White dwarf বা শ্বেত বামন। নাম রাখা হয়েছে P. G. 1031+2341। আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান। ১৯৭৯ সালে নক্ষত্রটি আবিষ্কৃত হয়। স্মিথের কথায় আরো ২০টি শ্বেত বামনের সংবাদ পাওয়া গেছে। এরপরও হয়তো নতুন নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যা সংকলকের জ্ঞাত নয়।

সৌরজগতে চাঁদের সংখ্যা

১৯৫২ সালে প্রকাশিত এই সংবাদের পর কৃত্রিম উপগ্রহ ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে মহাকাশ সম্পর্কে নিত্য নতুন সংবাদ আসছে। তবে শেষতম সংবাদ না জানলেও বলা যায় গ্রহগুলির উপগ্রহ সংখ্যা নিম্নরূপ—বলা দরকার বিজ্ঞানীরা আরো কয়েকটি নতুন গ্রহ আবিষ্কারের দাবি করেছেন।

গ্রহ-নাম	উপগ্রহ সংখ্যা বলয়ের সংখ্যা	[সূর্য থেকে অবস্থানগত দূরত্ব অনুসারে]
১. বুধ	উপগ্রহ নেই	
২. শুক্র	”	
৩. পৃথিবী	১টি : চাঁদ : বলয়হীন	
৪. মঙ্গল	২টি : ডিমোস এবং ফোবোস : বলয়হীন	
৫. বৃহস্পতি	১৬টি : [আরো থাকার সম্ভাবনা আছে] বলয় বিশিষ্ট	
৬. শনি	২২টি : [আরো থাকা সম্ভব] : বলয় বিশিষ্ট	
৭. ইউরেনাস	৫টি : বলয় বিশিষ্ট	
৮. নেপচুন	২টি : নেরিদ এবং ট্রাইটন : বলয় বিশিষ্ট [সম্প্রতি ভয়েজার২ আরো ৪টি চাঁদ আবিষ্কার করে নাম দিয়েছেন 1989N1, 1989N2, 1989N3, এবং 1989N4	
৯. প্লুটো	১টি : চ্যারন [বা ক্যারন] : বলয়হীন	
মোট	৫৩টি : ৪৫টি বলয় বিশিষ্ট	

চন্দ্রলোকে ভ্রমণ / কৃত্রিম উপগ্রহ / কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ / মহাশূন্য পরিক্রমায় ব্যবহার্য পোশাক

আজকের সংবাদ আগামীকাল হয়ে যায় পুরনো। তাই সংবাদপত্র/সাময়িক পত্রের পাঠকদের কাছে বাসি খবর-এর দাম নেই। সংবাদপত্র-পত্রিকা কিলো দরে বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে পুরনো সংবাদ—তা' যত পুরনো হবে—তার দাম বাড়বে ততোই। জনপ্রিয় বিজ্ঞান পাঠকও চাইবেন টাটকা খবর বা টাটকা তত্ত্ব বা পুরনো আবিষ্কারের ইতিহাস অথবা তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা।

কিন্তু এই সংকলনটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানের সর্বমান্য মাপকাঠিতে সংকলিত হয়নি। তাই, এখনকার পাঠকদের কাছে এ-সব সংবাদ বাসি খবর। তা, জেনেও পরিবেশন কেন করা হচ্ছে সে সব খবর? আর কিছুই না—মাত্র পাঁচের দশ-কেও যা ছিল কল্পনা থেকে সম্ভাবনা সে-সময়ের প্রয়াসের খবরগুলো এখন হয়ে গেছে বিজ্ঞানের ইতিহাস। আর বিজ্ঞানের ইতিহাসের মূল্যও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে মূল্যবান বিবেচিত হয়।

হিন্দু পুরাণে বিশ্বামিত্রর 'নবস্বর্গ' গঠনের কাহিনী বা ১৭০০ বছর আগে গ্রীক বিজ্ঞানীদের গ্রহান্তর যাত্রার বাক্-বিতণ্ডার খবর আমরা জানি। কিন্তু ভুলে গেছি কেপলা-রের 'চন্দ্র লোকের যাত্রী' বইটির কথা। উইলকিনস্, সিরানো-ডি-বারগেরাকও বিস্মৃত। কিন্তু জুলে ভের্ন আজও সমাদৃত। মহাশূন্যে যাত্রার আয়োজন ১০০।২০০ বছরের নয়। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক বৈজ্ঞানিকদের 'রকেট'-এর পরিকল্পনা থেকে ফরাসী বিজ্ঞানী পেলভিয়ার, রুশ জিওল্-কোভুস্কি; মার্কিন গডার্ড-এর প্রয়াসের খবর ক'জন রাখি? ১৯১৫—৩৬ পর্যন্ত গডার্ড-এর পরীক্ষা নিরীক্ষা, ১৯২৬-এ রকেট ক্ষেপণ থেকে সংকলনে প্রকাশিত পারমাণবিক যুগে চন্দ্রলোক ভ্রমণ, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তখনো জল্পনা-কল্পনার বিষয় ছিল। সোভিয়েত-এর সফল প্রয়াসের পর থেকে শুরু হয়ে গেলো কল্পনা থেকে বাস্তবের যুগ। আর্মস্ট্রং-এর চন্দ্রাভিযান থেকে ভাইকিং-ম্যারিনার-ভয়েজার-এর যুগ চলেছে। এইতো সে-দিন ফোবোস-২ মঙ্গলের চন্দ্র ফোবোস সম্পর্কে যে-সব সংবাদ পাঠালো তা থেকে মঙ্গলে মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আর প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু স্বপ্ন দেখা পরমাণুবিদ্ জুইকি-র স্বপ্ন

হয়তো একদিন বাস্তব হয়ে উঠবে। তখন আবার আজকের টাটকা খবর হয়ে যাবে ইতিহাসের উপাদান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এগিয়েই চলেছে এই সব সংবাদ হচ্ছে তার পাথুরে প্রমাণ।

মঙ্গলগ্রহে জীবন্ত পদার্থ

মহাকাশ বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দানিকেন-বাদের দাপট লক্ষ্য করলে মনে পড়ে জুল ভের্ন থেকে বাংলায় 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন'-এর কথা।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সালে আমেরিকানরা ম্যারিনার-৫, ৬, ৭ এবং ৯ নামে চারটি রোবট মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের জন্য পাঠায়। ১৯৭৬ সালে ভাইকিং-১ এবং ২ পাঠায়। এইসব মহাকাশযান তাদের রোবট যন্ত্র মারফৎ (ভাইকিং-১-এর রোবটটি ছিল মঙ্গলগ্রহ প্রদক্ষিণ করতে করতে ফোটো ও তথ্যপ্রেরক এবং ভাইকিং-২-এর রোবটটি ছিল মঙ্গলগ্রহে অবতরণক্ষম) যে সব ছবি, তথ্য, উপাদান পাঠিয়েছে তা থেকে এখনো পর্যন্ত বলা যায় মঙ্গলও চাঁদের মতো মৃত। এখানে মানুষ কেন উদ্ভিদেরও থাকা সম্ভব নয়।

অতি সম্প্রতি ১৯ মে ১৯৯০-এর সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার 'বিজ্ঞানের টুকরো খবর' শিরোনামে প্রকাশিত বিজ্ঞান সংবাদ থেকে জানা যায় 'গত বছর মঙ্গল গ্রহ এবং তার একটি উপগ্রহ ফোবোস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ফোবোস-১ এবং ফোবোস-২ নামে দুটি মহাকাশ যান পাঠিয়েছিল সোভিয়েত মহাকাশ সংস্থা।' ফোবোস-১ মহাকাশে হারিয়ে গেলেও ফোবোস-২ মঙ্গলের চাঁদ ফোবোস সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাঠিয়েছে। যথা—ফোবোস

দেখতে আলুর মতো। সবচেয়ে লম্বা অঞ্চলের দৈর্ঘ্য ২৫ কিলোমিটার। প্রসঙ্গত বলা দরকার অল্প কিছুকাল আগে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি দাবি করেছিলেন চ্যারন বা ক্যারন যুগল উপগ্রহ।

প্রসঙ্গত স্মরণ করি কালিফোর্নিয়ার পরমাণুবিদ্ জুইকির 'স্বপ্ন' বা তত্ত্বের কথা। তিনি মনে করতেন যে, এমন একদিন আসবে যখন মানুষ বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সৌরগোষ্ঠিকে নিজের প্রয়োজনমতো বিন্যস্ত করে নেবে। মানুষের পক্ষে যে মঙ্গলগ্রহ আজ বাসযোগ্য নয় সেই গ্রহকেও কক্ষচ্যুত করে মানুষের বাসযোগ্য করবে।

বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ ব্যাধি

ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে 'গ' স্বাক্ষরিত এই সংবাদ নিবন্ধ রচনাকালে কুষ্ঠ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে আজকের ধারণার পার্থক্য বিস্তর। সংক্ষেপে বলা যায়:

১. যাবতীয় সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে কুষ্ঠ সবচেয়ে কম সংক্রামক।

২. সংক্রামক কুষ্ঠ বিশেষ এক ধরনের কুষ্ঠরোগ (লেপ্রোমেটাস) থেকে হয়। সেক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞরা বলেন স্বামী বা স্ত্রী একজন যদি এই ধরনের কুষ্ঠরোগী হন, তাহলেও অন্যজনের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ৫% শতাংশ।

৩. অঙ্গ বিকৃতি দেখা দেয় দীর্ঘদিন অচিকিৎসা বা কুচিকিৎসার জন্য।

৪. মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি নামক জীবাণুর সংক্রমণ থেকে কুষ্ঠ হয়।

৫. প্রোটিন, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, পিরাডসিন ইত্যাদি ভিটামিন 'বি'-যৌগ এবং ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতি প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিশেষভাবে কমায়। অনেক লোক অল্প জায়গায় ঘেঁসাঘেঁসি করে বাস করলে, তাদের পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য না জুটলে এবং এরকম অবস্থায় সংক্রামক কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে এলে কুষ্ঠরোগের সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। অর্থাৎ জীবাণু কুষ্ঠরোগের আপাত কারণ হলেও দারিদ্র্যই আসল কারণ।

১৯৭৫-এর একটি সমীক্ষা অনুসারে সারা পৃথিবীতে দেড় কোটি কুষ্ঠরোগীর মধ্যে ভারতে আছে ৪০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ৫ জন। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজারে দশ জন।

কুষ্ঠরোগে লেপ্রোমেটাস রুগীদের চিকিৎসা করা হয় মূলত রিফামপিসিন, ক্লোফাজিনিন ও ড্যাপসোন ওষুধের সাহায্যে। আর টিউবারকুলয়েড রোগীদের চিকিৎসা করা হয় রিফামপিসিন ও ড্যাপসোন দিয়ে। এছাড়াও প্রয়োজনে ফিজিওথেরাপী ও শল্যবিদ্‌দের সাহায্য নেওয়া হয়। ঠিক সময়ে সুচিকিৎসায় কুষ্ঠ সারে এবং পরিবারের মধ্যে রেখেই অনেক সময় এই ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব। অবশ্যই লেপ্রো-মেটাস আক্রান্তদের আলাদা রাখতে হবে।

সালফোট্রেন [?]

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে সালফোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। এই সালফোন বা সালফোট্রেন এখন ব্যবহৃত হয় না।

[তথ্যসূত্র—'সাধারণের অসুখ-বিসুখ' : সম্পাদক ডঃ সুখময় ভট্টাচার্য : নরমান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন-কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৯০]

কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি সম্ভাবনা

১৯৫২ সালের সংবাদের শিরোনামে 'সম্ভাবনা' শব্দটি বর্তমানে 'সম্ভব' শব্দে পরিণত। এই কলকাতা শহরেই জন্মেছে নল-জাতক। বিদেশের কথা সকলেই জানেন। বাংলায় লণ্ডন প্রবাসী এক চিকিৎসক নলজাতক নিয়ে একটি উপন্যাসও লিখেছেন। প্রকাশিত হয়েছে দে'জ থেকে।

সংকলিত তথ্যগুলি ৩৭।৩৮ বছর আগের। কিন্তু এই চার দশকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রমাণ করছে—প্রয়োজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে সহজবোধ্য বিজ্ঞান সংবাদ। আর এই বিজ্ঞান সংবাদ হবে ধারাবাহিক এবং আগের সংবাদের পরিপূরক।

বিজ্ঞান সাংবাদিক গোপালচন্দ্রের এই সংবাদ নিবন্ধগুলি অবশ্যই আজকের বিচারে 'মডেল' বলে বিবেচিত হবে না। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ও সম্পাদকমণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা জানাই এই সুযোগে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের পঁচানব্বইতম জন্মদিনে
দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাংলাভাষীদের কাছে গোপালচন্দ্র পরিচিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যের সেবক হিসেবে যতোটা, বিজ্ঞানী হিসেবে ততোটা নন। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহার মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কথা আমরা জানি। জানি সত্যেন্দ্রনাথের অসামান্য উদ্যোগ ও ভূমিকার কথা। কিন্তু 1919 থেকে 1971 পর্যন্ত ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনায় গোপালচন্দ্রের গরিমাময় ভূমিকা তুলনারহিত। প্রায় ৮০০-র মতো তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অধিকাংশই অধুনালুপ্ত নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবাসী, প্রকৃতি, নূতন পত্রিকা, মন্দিরা, দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত লেখা থেকে কিছু কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে মাত্র। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের জন্মলগ্ন থেকে সত্যেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার নিরলস সেবক গোপালচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি নূতন প্রজন্মের জন্য সংকলিত হ'ল।

জন্ম 1 অগাস্ট 1895 [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিভুক্ত তারিখ। গোপালচন্দ্র অবশ্য নালন্দা ইয়ার বুকের জন্য সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জিতে জন্মসাল দিয়েছিলেন 1898।]

শৈশব-কৈশোর অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার অন্তঃপাতী লোনসিংহ গ্রামে জন্ম। বাবা অম্বিকাচরণ, মা শশিমুখী দেবী। বাবা ছিলেন দরিদ্র পুরোহিত। গোপালচন্দ্ররা চার ভাই। জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র, মধ্যম নেপালচন্দ্র এবং পরের যমজ দুই ভাই পঙ্কজবিহারী ও বঙ্কিমবিহারী। বর্তমানে পঙ্কজবিহারীই জীবিত। গোপালচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়সে বাবার অকালমৃত্যু হয়। ব্যক্তিত্বময়ী শশিমুখী চারটি শিশুপুত্রকে তাদের প্রতিপালনের জন্য সচেষ্ট হলেন। গোপালচন্দ্রের যখন দশ বছর বয়স—তখন তাঁকে পৈতে দিয়ে যজমানী কাজে মা শশিমুখী নিয়োগ করলেন। মেধাবী গোপালচন্দ্রের শৈশব সুখের ছিল না, খেলাধুলাতেও মন ছিল না। মেধাবী ছাত্রের পড়াশুনায় আগ্রহ লক্ষ করে লোনসিংহ হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দিয়েছিলেন।

শিক্ষা 1913 সাল গোপালচন্দ্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

1913-15 ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে আই. এ.-তে ভর্তি হন। আর্থিক কারণে পড়া অসমাপ্ত রেখেই গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করতে হয়।

বিবাহ 1914 [?] ঢাকার শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও হেমপ্রভা [?] দেবীর বড় মেয়ে লাবণ্যময়ী চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে হয়। তাঁর চার ছেলে সুধীরচন্দ্র, বিনয়ভূষণ, নীহাররঞ্জন, মিহিরকুমার এবং এক মেয়ে রানী বন্দ্যোপাধ্যায়। মিহিরকুমার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে যুক্ত এবং একসময় বাংলায় অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

কর্মজীবন 1915-19 প্রথমে পণ্ডিসরে এবং পরে নিজের গ্রামের স্কুলে। স্কুলের বাগানে ছাত্রদের নিয়ে "গাছপালা সম্বন্ধে সাধ্যমত পরীক্ষাদি করতাম। কৃত্রিম উপায়ে ফুলের পরাগ সঙ্গম ঘটিয়ে সঙ্কর উদ্ভিদ তৈরির চেষ্টা, কলমের সাহায্যে একই গাছে দু-তিন রকমের ফুল উৎপাদন করা ইত্যাদি ছিল পরীক্ষার বিষয়।" দ্র. বিজ্ঞান অমনিবাস; গোপালচন্দ্র পৃ. 2 : দে'জ পাবলিশিং।

এই সময়ে গোপালচন্দ্র এক বর্ষার সন্ধ্যায় স্কুল বোর্ডিং-এর আড্ডায় ভূতের গল্পের তর্কে 'পাঁচীর মা-র ভিটা'য় গিয়ে সংগ্রহ করে এনেছিলেন ভৌতিক আলোর রহস্য সূত্র। এই দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ আছে তাঁর খণ্ড-স্মৃতিচারণে, 'মনে এলো' নামে যা সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্র. 'বিজ্ঞান অমনিবাস।'

এই পর্বেই 'শতদল' [1917] নামে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ, 'কাব্যবিশারদ ধরণে' [কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৮৬১-১৯০৭] ব্যঙ্গাত্মক পদ্য রচনা, জারি গানের দল গঠন, নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য 'কমলকুটির' সংস্থা স্থাপন এবং প্রকৃতি নিরীক্ষণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

> লোনসিংহ গ্রাম ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। এখন থেকে ষাট বছর আগেকার পল্লী বাংলার একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামে সামাজিক অনুশাসন, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে, কিরকম কঠোর এবং স্বেচ্ছামূলক ছিল, আজকের লোকেরা ত কল্পনাও করতে পারবেন না। তরুণ গোপাল চন্দ্র এই সামাজিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এক অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। হিন্দু সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি 'কমলকুটির' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। দ্র. পঙ্কজবিহারী ভট্টাচার্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞান : গোপালচন্দ্র স্মরণ সংখ্যা 1981, পৃ. 425।

1919-21 কলকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের কাশীপুরের এক অফিসে টেলিফোন অপারেটরের চাকুরি। **1921-71** বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রথমে জগদীশ চন্দ্রের সহকারী, পরে গবেষকের বৃত্তি।

গবেষণা। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে শুরু, কিন্তু পরে বেছে নিলেন কীট-পতঙ্গ, জৈবদ্যুতি এবং শেষ পর্বে ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ-এ রূপান্তরে পেনিসিলিন-এর ভূমিকা।

1928 সালে জগদীশচন্দ্রের নির্দেশে অধ্যাপক মলিশের জৈবদ্যুতি গবেষণায় সহকারী।

1930 সালে বাংলার মাছখেকো মাকড়সা সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে ড. করমনারায়ণ বহালের অনুমোদনে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের 1931-32-এর ট্র্যানজাকশনে প্রকাশিত হয়। দ্র. 'বিজ্ঞান অমনিবাস'; পৃ-267-76।

1934-1935 পিঁপড়ে-অনুকারী মাকড়সা, টিকটিকি-শিকারী মাকড়সা, সম্পর্কে চারটি গবেষণা পত্র যথাক্রমে (বম্বে ন্যাচুরাল হিস্ট্রি সোসাইটির জার্নালে, আমেরিকার সায়েন্টিফিক মান্থলি, কলকাতার সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার-এ প্রকাশিত হয়।

গোপালচন্দ্রের কাজ সম্পর্কে ডঃ নগেন্দ্রনাথ নাগকে (তৎকালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সহ-অধ্যক্ষ) জগদীশচন্দ্রের চিঠির অংশ :

My dear Nagendra,

Iam glad that Gopal is sending the two papers for the Bombey Natural Society. This will bring in touch with other works on similar line, and he can then exchange notes with them.

1936 থেকে 1943 সালের মধ্যে তাঁর 14টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। [বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'বাংলার কীট-পতঙ্গ' : দে'জ সংস্করণের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।] লক্ষণীয় 1936 থেকে 1938-এর মধ্যেই 14টি গবেষণা পত্রর 9টি প্রকাশিত হয়। 1933-এ জার্মানিতে হিটলারের দাপট। ফলে, জগদীশচন্দ্রের বাসনা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। ডঃ রতনলাল ব্রহ্মচারী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 'গোপালবাবু যখন একা একা তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন, তখন বিজ্ঞানের [এই] শাখার মূল ধারা ছিল জার্মানিতে। যদি তিনি এই মূল ধারার অংশ হয়ে যেতে পারতেন, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী-ত্রয়ী—লরেঞ্জ, টিনবার্গেন বা ফন ফ্রিন-এর সমগোত্রীয় হয়ে যেতেন।" দ্র. বাংলার কীট-পতঙ্গ : দে'জ সংস্করণ, পৃ. 182।

1952-1971 ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ-এ রূপান্তরে পেনিসিলিনের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা।

সাহিত্য ছেলেবয়স থেকে পদ্য রচনা। 'শতদল' হাতের লেখা পত্রিকা সম্পাদনা। 1920 নাগাদ কাজের লোক (Businessman) ও সনাতন-এর দায়িত্ব গ্রহণ।

প্রবাসী, প্রকৃতি সহ নানা পত্র-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ। 1947 [?] 'সংগঠনী' পত্রিকার সম্পাদনা। 1948-এ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অঘোষিত সম্পাদক, 1950 থেকে ঘোষিত সম্পাদক। পরে প্রধান সম্পাদক, 1977 থেকে আমৃত্যু প্রধান উপদেষ্টা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর 'ভারত কোষ'-এর চারখণ্ডের সম্পাদনা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পরিভাষা কমিটির সদস্য হিসেবে পরিভাষা প্রণয়ন। সংখ্যা ঠিক জানা নেই—তবে একাধিক বিজ্ঞান গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন।

স্বীকৃতি ও সম্মাননা 1951 প্যারিসে অনুষ্ঠিত সামাজিক-পতঙ্গ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে ভারতীয় শাখা পরিচালনার জন্য আমন্ত্রিত।

1968 আনন্দ পুরস্কার।

1974 বসু বিজ্ঞান মন্দিরে নাগরিক সংবর্ধনা।

1974 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফলক প্রাপ্তির সম্মান।

1975 'বাংলার কীট-পতঙ্গ' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার।

1979 বসু বিজ্ঞান মন্দিরের হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে জুবিলি মেডেল।

1980 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. এস-সি.। [সম্ভবত তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অস্নাতক বাঙালি—সাম্মানিক ডি. এস-সি. ডিগ্রি প্রাপক।]

গ্রন্থসংখ্যা বারোটি। অনুবাদ দুটি। সহলেখক হিসাবে একটি গ্রন্থ। মোট পনেরোটি।

মৃত্যু 8 এপ্রিল 1981।

বাংলার জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভূমিকা বিতর্কাতীত । এ বইতে গোপালচন্দ্রের অস্বাক্ষরিত বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার নিদর্শন হিসেবে রয়েছে বিজ্ঞানের খবর-এর কিছু রচনার সংকলন । এসব পড়তে পড়তে আগ্রহী পাঠকের কাছে গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে । প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং সংবাদ থেকে শুরু করে কলেরার টিকা, বাংলাদেশে কুষ্ঠ– এরকম নানা খবরের সঙ্গে ছোটরা জানতে পারবে ৪০ বছরে কতখানি এগিয়েছে বিজ্ঞান ।